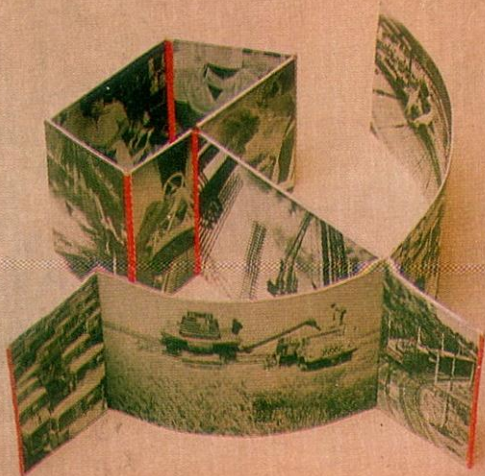


সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-থ

দ. ক্রেমেন্ডিয়েভ, ত. ভাসিলিয়েভা

সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়





সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ

দ. ক্লেমেন্তিয়েভ, ত. ভাসিলিয়েভ

সমাজতত্ত্বে কী বোঝায়



প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-থ
গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী:

ফ. ভলকভ (প্রধান সম্পাদক), ইয়ে. গুবস্কি (প্রধান
সহসম্পাদক), ফ. বুল্গাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. গ্রাপিভিন,
ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউর্লভ

ABC социально-политических знаний

Д. Клементьев, Т. Васильева

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ?

На языке бенгали

ABC of Social and Political Knowledge

D. Klementyev, T. Vassilyeva

WHAT IS SOCIALISM?

In Bengali

© Progress Publishers, 1986

বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

K $\frac{0603010200-416}{014(01)-88}$ 306-88

ISBN 5-01-000813-0

সূচি

ভূমিকা	৫
প্রথম অধ্যায়। ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞান . . .	৭
১। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অগ্রদূত ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র	৭
২। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বদাতা মার্কস, এঙ্গেলস	১৬
৩। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকাশে লেনিনীয় পর্যায়	৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায়। বাস্তব সমাজতন্ত্র	৪২
১। সমাজব্যবস্থা হিশেবে সমাজতন্ত্র	৪২
২। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	৫৮
৩। রাজনৈতিক ব্যবস্থা	৮০
৪। সামাজিক বিকাশ	৯২
৫। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি	১০৪
তৃতীয় অধ্যায়। বাস্তব সমাজতন্ত্র ও বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	১১৫
১। সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা	১১৫

২। সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিতন্ত্রের দুনিয়া	১২৪
৩। উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা	১৩৫
৪। সমাজতন্ত্র এবং বর্তমান কালের ভূমণ্ডলীয় সমস্যা	১৪৮
চতুর্থ অধ্যায়। সমাজতন্ত্র ও শান্তির জন্মযাত্রা	১৬৭
উপসংহার	১৭৯
ব্যবহৃত পরিভাষার সংক্ষিপ্ত অর্থ	১৯১

ভূমিকা

বিশ শতক মানবজাতির জীবনে একটা খরবেগ ও সুগভীর পরিবর্তনের যুগ। প্রগাঢ় বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে তা চিহ্নিত, যা সমাজতন্ত্রের পথ খুলে দিচ্ছে। বিশ্বে যে প্রক্রিয়া চলেছে তা প্রতিটি লোকের কাছ থেকে তার সুস্পষ্ট উপলব্ধি, জীবনের প্রতি একটা সচেতন মনোভাব গ্রহণের দাবি করে।

সমাজতন্ত্র যে অনিবার্য, বৈজ্ঞানিকভাবে তা প্রতিপাদন করেছিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, তা নির্মাণের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, আজ তা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বাস্তব কর্মকান্ড। বর্তমানে সমাজতন্ত্র পরিণত হয়েছে একটা বিশ্ব ব্যবস্থায়—স্বাধীন, সমাধিকারী জাতিগোষ্ঠীর একটা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহমিতালিতে।

শোষণ, বদভুক্ষা, নিঃস্বতা আর বেকারি

নিমর্দল করেছে সমাজতন্ত্র; উৎপাদনের উপায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে সামাজিক মালিকানা। সামাজিক মালিকানার বনিয়াদের ওপর পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছে প্রবল উৎপাদনী শক্তি। সমাজতান্ত্রিক সমাজ এনে দিয়েছে মেহনতিদের সামাজিক মর্দুতি, তাদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নয়নে গড়ে উঠেছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিস্থিতি।

এ বইটিতে বলা হয়েছে সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বাস্তবে বিদ্যমান সমাজতন্ত্র, তার বিকাশের নিয়মবদ্ধতা, সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রায়োগিক কর্মযোগ আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপ্রয়াসী আন্তর্জাতিক পলিসির কথা।

প্রথম অধ্যায়

ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞান

১। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অগ্রদূত ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র*

পৃথিবীতে উন্নত জীবনে বিশ্বাস করতেন মহান স্বপ্নদ্রষ্টারা। তাঁদের বলা হয় ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী। ভবিষ্যৎ সমাজের মডেল রচনা করে তাঁরা যে তত্ত্ব প্রণয়ন করেন, সেগুলি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আবির্ভাবের অগ্রদূত, এই শেষোক্ত মতবাদটি কমিউনিস্ট সমাজ স্থাপনের ঐতিহাসিক আবশ্যিকতা, তা সৃষ্টির পথ ও সংগঠনের নীতিকে প্রতিপাদিত করে।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা হলেন মানববাদী ইংরেজ মনীষী ট. মুর (১৪৭৮-১৫৩৫), ইতালীয় মনীষী ত. কম্পানেলা (১৫৬৮-১৬৩৯), জনগণের দরিদ্র স্তরের ভাবপ্রবক্তা ড. উইনস্টেনলি (১৬০৯-মোটামুটি ১৬৫২), ফরাসি গ্রাম্য যাজক জ. মেলিয়ে (১৬৬৪-১৭২৯),

* ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র — ট. মুরের 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থের নামানুসারে পরিভাষা।

ফরাসি চিন্তানায়কেরা: মরেলি (১৮ শতক), গ. মার্বিল (১৭০৯-১৭৮৫), গ. বাবেফ (১৭৬০-১৭৯৭), আ. সাঁ-সিমোঁ (১৭৬০-১৮২৫), শ. ফুরিয়ে (১৭৭২-১৮৩৭), ইংরেজ মনস্বী র. ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮), রুশ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী ভ. গ. বেলিনস্কি (১৮১১-১৮৪৮), আ. ই. গেৎসেন (১৮১২-১৮৭০), ন. গ. চের্নিশেভস্কি (১৮২৮-১৮৮৯) প্রভৃতি। বিভিন্ন কালের লোক তাঁরা, এসেছেন বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক স্তর থেকে। কিন্তু যে ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার আধিপত্য, শোষণের রাজত্ব, যে সমাজ শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত, জাতিভেদমূলক বেড়ায় বিভক্ত তার ধিক্বারে, মানবজাতির শ্রেয় ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্ট আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা সকলে এক।

তাঁদের কয়েকজনের ধ্যানধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক।

টমাস মুর — ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। স্বকালের একজন বিদগ্ধ মানুষ। ইংলন্ডের লর্ড চ্যান্সেলার পদে (তৎকালের প্রধান মন্ত্রীর অনুরূপ) অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি আশা করেছিলেন যে রাজার পলিসিকে ভালোর দিকে চালাতে তিনি এ পদ কাজে লাগাতে পারবেন। কিন্তু ক্ষমতা ও গির্জার প্রধান বলে রাজঘোষণার শপথ গ্রহণে অস্বীকার করায় তাঁকে প্রাণ দিতে হয়।

যে প্রধান রচনার জন্য মুর অমরত্ব লাভ করেছেন তার নাম ‘রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা আর নতুন স্বীপ

ইউটোপিয়া* সম্পর্কে যেমন হিতকর, তেমনি কৌতুকপ্রদ স্বর্ণগ্রন্থ, এখন তা কেবল 'ইউটোপিয়া' নামেই প্রচলিত। এ বইয়ে একেবারে নতুন, অভূতপূর্ব, আদর্শ এক সমাজের কথা বলা হয়েছে যেখানে শোষণ নেই, সকলেই খাটে, সবাই সুখী। নতুন সমাজব্যবস্থার একটা তন্নতন্ন ছক দিয়েছেন মুর।

রাজনীতিতে তাঁর সময়কার কতকগুলি তাঁর সামাজিক প্রশ্নের উত্তরদানের প্রয়াস মুরের মহৎ কীর্তি। সামাজিক অন্যায়ের মূল কারণ তিনি দেখেছিলেন উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং তিনিই প্রথম সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠনের আবশ্যিকতার প্রশ্ন তুলেছিলেন।

১৯শ শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত হয়, দ্রুত বিকশিত হতে থাকে পুঁজিতন্ত্র। বেড়ে ওঠে শিল্প প্রলেতারিয়েত। সমাজে ক্রমেই বেশি করে দুই মেরুপ্রান্তে জমতে থাকে বুর্জোয়া শ্রেণী আর উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা থেকে বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণী। শ্রেণী সংগ্রাম তখনো বিকশিত নয়, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত

* ইউটোপিয়া, গ্রীক 'u' — নাই, এবং 'tópos' — স্থান, অর্থাৎ যে জায়গার অস্তিত্ব নেই। অন্য ব্যাখ্যায়, গ্রীক 'eu' — সম্পদ, এবং 'tópos' — স্থান, অর্থাৎ সম্পদশালী দেশ।

হাঙ্গামা ঘটছে ক্রমেই ঘন ঘন। এই পরিস্থিতিতে দেখা দেয় সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েনের ইউটোপীয় ব্যবস্থা।

আঁরি সাঁ-সিমোঁ বনেদি অভিজাত বংশের লোক। কিন্তু ১৭৮৯-৯৪ সালের মহান ফরাসি বিপ্লব যখন ফুঁসে ওঠে, সাঁ-সিমোঁ তাকে স্বাগত করেন। তবে মহান ফরাসি বিপ্লবের যুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম যে রূপ নিয়েছিল পুরনো অভিজাত ঐতিহ্যের প্রভাবে তিনি তাতে ক্ষুদ্র হয়ে ওঠেন, বিপ্লব থেকে সরে যান; রাজনৈতিক সংগ্রামে কোনো অংশ আর নেন নি।

উনিশ শতকের গোড়ায় সাঁ-সিমোঁ একেবারে দারিদ্র্যের সীমায় এসে দাঁড়ান। কিন্তু এই পর্ব থেকেই শুরুর হয় তাঁর ফলপ্রসূ সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর রচিত ব্যবস্থা নিয়ে খেটে যান।

যে আদর্শ সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তার খসড়াটা কিরকম? এ সমাজ বিজ্ঞান আর শিল্প, বিজ্ঞানী আর শিল্পপতিদের দ্বারা পরিচালিত। হিতকর কাজে লিপ্ত লোকেদের সংঘ। সমাজজীবনের মূলনীতি সেখানে শ্রম। এমন সমাজব্যবস্থা যে সম্ভব যেখানে প্রত্যেকেই খাটে তার সামর্থ্য অনুসারে, পায় শ্রম অনুযায়ী, এমন কথা সাঁ-সিমোঁই হাজির করেন প্রথম।

তবে বৈরী শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত আর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মিটমাট সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে, তাদের গঠন করা উচিত 'শিল্পজীবীদের' একটি শ্রেণী।

শার্ল ফুরিয়ের জীবন বেশির ভাগ কাটে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চাকরিতে। তাঁর সমসাময়িক যে ব্যবস্থা ছিল নির্মম আর অমানুষিক, একদল যেখানে পদুষ্ট হত অন্য দলের ঘাড় ভেঙে, তাতে খেন্না ধরে যায় ফুরিয়ের। তাঁর মতবাদের সর্বাধিক বলিষ্ঠ দিক হল পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনা।

সুখের সুত্র রচনাকে তিনি গণ্য করেছিলেন তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য বলে, যা মানবিক চাহিদার সম্পূর্ণ পূরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফুরিয়ের মতবাদের প্রধান কথা হল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের স্থলে সামাজিক সামঞ্জস্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা।

তবে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের প্রতি বিরূপ ছিলেন ফুরিয়ের, মনে করতেন যে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা কার্যকৃত করা যায় প্রচার, প্রত্যয়ের মাধ্যমে, এমনকি পুঁজিপতিদেরও বুঝিয়েও, এবং বৈরী শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত আর বুদ্ধিজীবীর মধ্যে মিটমাট সম্ভব।

রবার্ট ওয়েনের জন্ম ছোটো কারুজীবী পরিবারে। শিল্পবিপ্লবের ফলে যে নতুন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, নিজের সাংগঠনিক সামর্থ্যের গুণে তাতে তিনি দ্রুত এগিয়ে যান। ২০ বছর বয়সে তিনি সুতোকলের ডিরেক্টর, ৩০ বছর বয়সে স্কটল্যান্ডের একটি বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ পরিচালনার ভার নেন, যেখানে একসারি সামাজিক সংস্কারের প্রবর্তন করেন: শ্রমিকদের জন্য বাস্তব বদলে বানানো হতে থাকে সুবিধাজনক বাসগৃহ।

খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে উন্নতি হয়, নির্মিত হতে থাকে বিদ্যালয়, ক্রেশ, কিন্ডারগার্টেন। কারখানায় তিনি চালু করেন ইংলণ্ডে সাধারণত প্রচলিত ১২-১৪ ঘণ্টার স্থলে ১০-৫ ঘণ্টার কর্মদিন। ১৮০৬ সালে শিল্পসংকটের দরুন কারখানা যখন কাজ করছিল না, তখনো তিনি আগের মতোই শ্রমিকদের বেতন দিয়ে যান। অল্প সময়ের মধ্যেই শিল্পসমৃদ্ধ রিটেনের এই কোণটা হয়ে দাঁড়ায় একটা আদর্শ জনপদ। তার খ্যাতি ছড়ায় ইংলণ্ড ছাড়িয়ে বহুদূর। শোষক দুনিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে ওয়েনের ওপর।

কিন্তু ওয়েন ইতিমধ্যে চলে আসেন বেকারি সমস্যার আলোচনায়, শ্রম বসতি বা শ্রম কমিউন গঠন করে তার আমূল সমাধানের পরিকল্পনা দেন। নিজের ভাবনার ব্যবহারিক রূপায়ণ দেখাবেন ঠিক করে ৫৩ বছর বয়সে ওয়েন যান আমেরিকায়, ভেবেছিলেন সেখানে যুগ-যুগের ব্যক্তি মালিকানা আর শোষণের রেওয়াজ না থাকায় নিজের কল্পনা কার্যকর করা তাঁর পক্ষে সহজ হবে। ইন্ডিয়ানা রাষ্ট্রে তিনি স্থাপন করলেন শ্রম কমিউন, তার নিয়মাবলির মূলকথা ছিল: নারী, পুরুষ ও বংশ নির্বিশেষে সমস্ত বয়স্ক লোকের সমান অধিকার; সাধারণ মালিকানা এবং জীবনের সমস্ত সম্পর্কে সখ্য। এই পরীক্ষায় ওয়েন ব্যয় করেন তাঁর জীবনের চার বছর এবং টাকাকড়ির বড়ো একটা অংশ। পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার গর্ভে কমিউনিস্ট কোষ গড়ার অধিকাংশ প্রচেষ্টার মতো এটিও শেষ হয় পরিপূর্ণ ব্যর্থতায়।

প্রায় ৬০ বছর বয়সে দেশে ফিরে বৃদ্ধ ওয়েন নিজের ধ্যান-ধারণা প্রয়োগের ভিত্তি খোঁজেন শ্রমিক আন্দোলনে, সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে একটি জাতীয় ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রচার চালান।

নিকোলাই গাব্রিলোভিচ চের্নিশেভস্কি। বিপ্লবী, মনীষী, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক। যাজক বংশে জন্ম, পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করার সময় 'হয়ে দাঁড়ান সমাজতন্ত্র ও বস্তুবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী। রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার* বিরোধী হিসেবে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য নিষ্ঠুর দমননীতির কবলিত হন: জীবনের ৬১ বছরের মধ্যে ২৭ বছরই তাঁর কাটে কারাগারে আর নির্বাসনে।

চের্নিশেভস্কি পুঞ্জিতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন উৎপাদনে নৈরাজ্য, প্রতিযোগিতা, সংকটের জন্য, মেহনতিদের শোষণের জন্য, শ্রমের সম্ভবপর সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে না পারার জন্য।

চের্নিশেভস্কির অর্থনৈতিক তত্ত্ব হল প্রাক্‌মার্ক্সবাদী অর্থনৈতিক চিন্তার শীর্ষবিন্দু। শোষণের অনিবার্যতা তিনি খণ্ডন করেন এবং দাবি করেন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি (দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, পুঞ্জিতন্ত্র) সাময়িক।

* সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক দিক, সামন্তদের, ভূস্বামীদের নিকট কৃষকদের অধীনতা বিধিবদ্ধ হয় আইনে: কৃষকরা থাকে জমির সঙ্গে বাঁধা। রাশিয়ায় এ প্রথার অবসান হয় ১৮৬১ সালে।

একটা ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের নিরীখ বলে তিনি মনে করতেন শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করায় তার সামর্থ্য।

ইতিহাসে, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের বিপ্লবে জনগণের ভূমিকা উপলব্ধির স্তরে উঠতে পেরেছিলেন চের্নিশেভস্কি। সাঁ-সিমোঁ আর ফুরিয়ে মনে করতেন যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানব ইতিহাসের যেকোনো পর্যায়েই উদ্ভূত হতে পারে, তাঁদের থেকে চের্নিশেভস্কির পার্থক্য এই যে তিনি মনে করতেন, সমাজতন্ত্র মানবজাতির সমগ্র বিকাশ দ্বারা শর্তবদ্ধ।

কিন্তু ইউটোপীয় হিশেবে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে রাশিয়ার পক্ষে কৃষক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব, তিনি ছিলেন গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। সমাজতন্ত্রে সত্যকার পথ তিনি খুঁজে পান নি, বোঝেন নি প্রলেতারিয়েতের ভূমিকা।

তবে চের্নিশেভস্কির ধ্যান-ধারণা এবং তাঁর উপন্যাস 'কী করণীয়?' (১৮৬২-১৮৬৩) আর 'প্রস্তাবনা' (মোটামুটি ১৮৬৭-১৮৬৯), যাতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শাদি পেশ করা হয়েছে এবং বিপ্লবীর মর্দতি' আঁকা হয়েছে, তা রুশ বিপ্লবীদের বহু পুরুষদের লালনে পালন করেছে এক বিরূপ ভূমিকা।

* * *

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ নির্ধারিত হয় সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ, তার সামাজিক

বিরোধগুলির তীব্রতা বৃদ্ধি দ্বারা। বিভিন্ন ইউটোপীয় তন্ত্রে প্রতিফলিত হয় উন্নততর জীবনের আশা, ন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থার কামনা।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের বিপুল কীর্তি এই যে পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনা করেন তাঁরা, প্রত্যয়জনকতার সঙ্গে দেখান যে শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ লোককে মর্দু, সাম্য, সৌভ্রাত, কিছুই দিতে পারে না।

ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থা নিয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা ভুলে ধরেছিলেন ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা। যেমন, উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার প্রয়োজনীয়তা, মানুষের প্রাথমিক চাহিদা হিশেবে শ্রম, শ্রম শিক্ষা, অর্থনীতির পরিকল্পিত চালনার প্রয়োজনীয়তা, নতুন ব্যবস্থার টেকনিকাল বনিয়াদ হিশেবে যন্ত্রশিল্প, ব্যক্তির সর্বাদ্ভীর্ণ বিকাশের কথা। খুবই মন দিয়েছিলেন তাঁরা বৈষয়িক সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের প্রশ্নে — যা হতে পারে শ্রম অনুসারে আর প্রয়োজন অনুসারে।

এইসব ধ্যান-ধারণা মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কাছে যাত্রারস্ত্রের মালমশলা হিশেবে কাজে লেগেছে। এঙ্গেলস লিখেছেন, ‘...তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্র কখনো ভুলবে না যে তা দাঁড়িয়ে আছে সাঁ-সির্মোঁ, ফুরিয়ে আর ওয়েনের কাঁধের ওপর — যে তিনজন মনীষী তাঁদের মতবাদের সমস্ত উৎকল্পনা আর ইউটোপীয়তা সত্ত্বেও সর্বকালের মহত্তম মননের অন্তর্গত, প্রতিভার সঙ্গে যাঁরা এমন অসংখ্য সত্যের

পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যা এখন আমরা প্রমাণ করছি
বৈজ্ঞানিক দিক থেকে...’*

তবে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা সমাজ বিকাশের
নিয়মবদ্ধতাটা বোঝেন নি; সেই সামাজিক শক্তিকে
দেখতে পান নি যা নতুন সমাজের স্রষ্টা হতে সক্ষম।
সেটা ঘটেছে কারণ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের দিন
কেটেছে এমন একটা পর্বে, প্রলোভনীয় আর
বুর্জোয়ার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম যখন বিকশিত নয়।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের
আগে আবির্ভূত সমাজতান্ত্রিক মতবাদ পুঞ্জিতান্ত্রিক
সমাজ বিকাশের নিয়ম উদ্ঘাটন করতে, পুঞ্জিতান্ত্রিক
সমাজে মজুরি দাসত্বের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতে পারে নি,
সক্ষম হয় নি নতুন সমাজের দিকে মানবজাতির গতির
নিয়মবদ্ধতা তত্ত্ব ও অর্থনীতির দিক থেকে প্রতিপাদিত
করতে, সে গতির পথ দেখাতে। সেগুলি ছিল
ইতিহাসের দিক থেকে সীমাবদ্ধ।

২। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বদাতা মার্কস, এঙ্গেলস

সামাজিক বিকাশের মূলগত প্রশ্নের জবাব দিতে পারে
নি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র। সামাজিক বিকাশের
বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রণয়নই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে যুগের

* Marx K., Engels F. *Selected Works* in three
volumes.—Moscow: Progress Publishers, 1976, Vol.
II, p. 169.

ঐকান্তিক দাবি। এ কর্তব্য পালন করেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) আর ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)। সমাজতন্ত্র বিজ্ঞানসিদ্ধ হয়ে ওঠে দুটি মহান আবিষ্কারের কল্যাণে। তা হল ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ আর বাড়তি মূল্যের মতবাদ।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ। মার্কসবাদের পূর্ববর্তী তত্ত্বগুলির সমস্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটা দৃষ্টি ছিল সাধারণ — সামাজিক জীবন ব্যাখ্যায় ভাববাদী মনোভঙ্গি।

সেটা আত্মপ্রকাশ করেছে এইখানে যে, প্রথমত, সর্বোত্তম ক্ষেত্রে সেগুলি লক্ষ করেছে কেবল লোকেদের ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের ভাবগত প্রেরণা, সন্ধান করে নি সে প্রেরণা আসছে কোথা থেকে, সামাজিক সম্পর্কব্যবস্থার বিকাশে অবজেকটিভ নিয়মবদ্ধতা ধরতে পারে নি, বৈষয়িক উৎপাদন বিকাশের মাত্রার মধ্যে এসব সম্পর্কের মূল তাদের দৃষ্টি এড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, আগেকার তত্ত্বগুলি জনগণের ক্রিয়াকলাপ, তাদের জীবনযাত্রার সামাজিক শর্ত আর সে শর্তের পরিবর্তনকে বিবেচনার মধ্যে ধরে নি।

সামাজিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রণয়নের অর্থ ছিল এইটে প্রমাণিত করা যে লোকেদের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ, অর্থাৎ বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন হল অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপের বনিয়াদ। ঠিক প্রমাণিত করাই, কেননা সমাজজীবনে বৈষয়িক উৎপাদনের প্রধান ভূমিকা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধিরাও স্বীকার

করতেন তবে বিনা প্রমাণে। তাই মার্কসের সমকালীন সামাজিক বিকাশের বিশ্লেষণ দেবার প্রয়োজন ছিল।

সেটা সম্ভব হয়েছিল সামাজিক উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উচ্চ মান থাকায়, যার বৈশিষ্ট্য ছিল উৎপাদন শক্তির যথেষ্ট উচ্চ মাত্রার বিকাশ, উৎপাদনের দ্রুতবর্ধমান সামাজিক চরিত্র লাভ, যখন শ্রমিক জনগণ একই শ্রম প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে কেবল এক-একটা উদ্যোগের কাঠামোর মধ্যেই নয়, সারা দেশের পরিসরে, যখন উৎপাদন বিকশিত হতে পারছে কেবল এই সমস্ত শাখার পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেই।

‘কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে’ (১৮৪৭-১৮৪৮) মার্কস ও এঙ্গেলস উৎপাদন উপায়ের কেন্দ্রীভবন, অল্পসংখ্যকের হাতে মালিকানার পুঞ্জীভবনের মতো দিকগতভাবে পুঞ্জিতান্ত্রিক উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যসূচক বলে চিহ্নিত করেন। শ্রেণী প্রাধান্যের শত বর্ষেরও কম সময়ের মধ্যে বর্জোয়ারা যে উৎপাদন শক্তি সৃষ্টি করে, সেটা তাদের পূর্ববর্তী সমস্ত প্রজন্ম একত্রে যা সৃষ্টি করেছিল, সংখ্যাবহুলতা আর বিরাটত্বের দিক থেকে তা অনেক বেশি। বর্জোয়া ব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধির পর্বে চান্দ্র প্রকাশ পেল সামাজিক বিকাশের ভিত্তি হিসেবে বৈষয়িক উৎপাদনের তাৎপর্য। সামাজিক সম্পর্কাদি গ্রহণ করল সুপ্রকটিত বৈষয়িক চরিত্র। আত্মপ্রকাশ করল পুঞ্জিতন্ত্রের মূলগত বিরোধ — উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে। উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র

দাবি করছিল বিকাশের সাধারণ পরিকল্পনশীলতা, তার এক-একটা শাখার বিকাশে উপযোগ্যতা, আনুপাতিকতা, অথচ ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে দেখা দিচ্ছিল উৎপাদন-সংকট, সাধারণ বিকাশ হয়ে থাকছিল এক-একজন পুঁজিপতির ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল।

সমাজবিদ্যায় মার্কস যা করেছেন, এঙ্গেলস তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে: ‘ডারউইন যেমন জৈব জগতের বিকাশের নিয়ম উদ্ঘাটিত করেছেন, মার্কস তেমনি মানবিক ইতিহাস বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন: সেটা এযাবৎ ভাবাদর্শীয় ঐতিহ্যের আড়ালে থাকা এই সোজা ঘটনাটা যে রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদিতে লিপ্ত হবার আগে লোককে খেতে হবে, পান করতে হবে, থাকার বাসা চাই তার, পোশাক চাই; সুতরাং জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ বৈষয়িক উপাদানগুলির উৎপাদন এবং তাতে করে জনগোষ্ঠীর বা যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিটি নির্দিষ্ট পর্যায় সেই ভিত্তি গড়ে দেয়, যা থেকে বিকশিত হয় রাষ্ট্রীয় প্রথাপ্রতিষ্ঠান, আইনি দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্প এমনকি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, সুতরাং তাই দিয়ে এগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে, উল্টোটা নয়, যা করা হয়ে আসছে এযাবৎকাল।’*

* Marx K., Engels F. *Selected Works* in three volumes.—Moscow: Progress Publishers, 1976, Vol. III, p. 162.

বৈষয়িক পরিস্থিতি থেকে মার্কস উপনীত হয়েছেন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, দেখিয়েছেন যে শেষ বিচারে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দিয়েই সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ নির্ধারিত।

বৈষয়িক, উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপেই নির্ধারিত হয় লোকেদের অন্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপ আর উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় যে বৈষয়িক সম্পর্ক দানা বাঁধে, তা দিয়ে নির্ধারিত হয় অন্যান্য ধরনের সামাজিক সম্পর্ক। উৎপাদনী সম্পর্কগুলির সমগ্রতা হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, তার বনিয়াদ, যার ওপর দাঁড়ায় আইনি ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো, সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলিও হয় তদনুসারী। 'লোকেদের চেতনা দিয়ে তাদের অস্তিত্ব নির্ধারিত হয় না, বিপরীত পক্ষে সামাজিক অস্তিত্ব দিয়েই নির্ধারিত হয় তাদের চেতনা।'*

সামাজিক অস্তিত্ব হল সমাজের বৈষয়িক জীবন, সর্বাগ্রে বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের প্রণালী এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় লোকেরা যেসব সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, সেগুলি।

সামাজিক চেতনা হল ভাবকল্প, তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি, মনোবৃত্তি, অভ্যাস আর ঐতিহ্যের সমষ্টি,

* Marx K. *A Contribution to the Critique of Political Economy*.—Moscow: Progress Publishers, 1977, p. 21.

যাতে প্রতিফলিত হয় প্রকৃতি, সমাজের বৈষয়িক জীবন এবং সামাজিক সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থাটা।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধে আদি বলে ধরা হয় সামাজিক অস্তিত্বকে।

‘সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা’ বলে একটা বিষয়কে সূচনির্দিষ্ট করেছেন মার্কস ও এঙ্গেলস। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল সামাজিক বিকাশের নির্দিষ্ট একটা পর্যায়ে অবস্থিত সমাজ। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে থাকে উৎপাদনের নির্দিষ্ট এক-একটা প্রণালী। উৎপাদনের প্রণালী হল উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক ঐক্য। নির্দিষ্ট উৎপাদনী সম্পর্কগুলির যে ব্যবস্থায় গড়ে ওঠে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক বনিয়াদ, তার রাজনৈতিক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় ও ভাবাদর্শীয় উপরিকাঠামোও হয় তদনুসারী। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে পড়ে শুদ্ধ অর্থনৈতিক নয়, নির্দিষ্ট সমাজটিতে বিদ্যমান সমস্ত সামাজিক সম্পর্কই, সেইসঙ্গে জীবনযাত্রা, পরিবার ইত্যাদির রূপও।

মানবজাতির বিকাশের যে ইতিহাস, তার সাধারণীকরণের ভিত্তিতে মার্কসবাদ ঐতিহাসিক প্রগতির বিভিন্ন ধাপস্বরূপ নিম্নোক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে নির্দিষ্ট করেছেন: আদিম ব্যবস্থা, দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক, কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই ক্রমান্বয় পরিবর্তনের কারণ সর্বাগ্রে, নতুন উৎপাদনী শক্তি আর অচল হয়ে পড়া উৎপাদনী সম্পর্কের

মধ্যে বৈরবিরোধ, নির্দিষ্ট একটা পর্যায়ে এ সম্পর্ক পরিণত হয় উৎপাদনী শক্তির নিগড়ে। উৎপাদনী সম্পর্কের সঙ্গে নতুন উৎপাদনী শক্তির সংঘর্ষের সমাধান হয় সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে। উৎপাদনের প্রণালী হল ঐতিহাসিক বিকাশের নির্ধারক কারিকা, এ বিকাশের চালিকা শক্তি — শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ, সমাজজীবনের ভিত্তি হিসেবে বৈষয়িক উৎপাদনের ভূমিকা প্রতিপাদিত করে মার্কস ও এঙ্গেলস ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা উদ্ঘাটিত করতে, তাদের সত্যকার মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম হন।

মেহনতিদের দঃখকণ্ঠের উৎস নিহিত রাজনৈতিক উপরিকাঠামোয় নয়, সমাজের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে। পীড়ন আর শোষণ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর, সমস্ত মেহনতির মুক্তি জড়িত সর্বাঞ্চে উৎপাদন প্রণালীতে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের সঙ্গে।

সেই বাস্তব সামাজিক শক্তিকে মার্কসবাদ আবিষ্কার করে যা পুঞ্জিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম। সে শক্তি হল প্রলেতারিয়েত। প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব, বিকাশ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বৈষয়িক উৎপাদন, শিল্পের সঙ্গে। শিল্পোৎপাদনের, উৎপাদনী শক্তির বিকাশে নির্ধারক ভূমিকা নেয় প্রলেতারিয়েত। সমাজে উৎপাদিত দ্রব্যের বিপ্লবাত্মক বৃদ্ধি তাদের সৃষ্টি। তাদের শ্রম জটিল টেকনিক সমন্বিত বড়ো বড়ো উদ্যোগে

শ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শিল্পের বিকাশে বৃদ্ধি পায় শ্রমিকদের সংখ্যা। প্রলেতারিয়েতের ভূমিকা বাড়ছে আর বুদ্ধিজীবী ক্রমেই সরে যাচ্ছে উৎপাদন থেকে, পরিণত হচ্ছে শিল্পবিকাশে বাধাদায়ক শ্রেণীতে।

প্রলেতারিয়েত সঙ্গতিপরায়ণ বৈপ্লবিক শ্রেণী। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের অবজেকটিভ অবস্থানের দরুন (উৎপাদনের উপায়ের ওপর প্রলেতারিয়েতের মালিকানা নেই, নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করে দেয়, শ্রমিকের শ্রমের বড়ো একটা অংশ পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ করে মুনাকাফা হিসেবে) তারা আগ্রহী কেবল নিজেদের মুক্তিতে নয়, শোষণ ও পীড়ন থেকে সমস্ত মেহনতি আর নিপীড়িতদের মুক্তিতেও। সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রলেতারিয়েত, সমস্ত মেহনতি আর শোষিতদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়, তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনে তারা সক্ষম।

মোটকথা, মার্কস ও এঙ্গেলস ইতিহাসের যে বস্তুবাদী বোধ, সমাজজীবন প্রসঙ্গে নীতিগতভাবে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপাদিত করেন, তার মর্মার্থ হল এই:

১। সমাজের ইতিহাস হল বিকাশের একটি অবজেকটিভ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।

২। সমাজজীবনের প্রক্রিয়াটির গবেষণায় 'সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' বলে একটা ব্যাপার মনে রাখতে হয়।

৩। উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত-পুঁজিতান্ত্রিক রূপের বিরোধী।

৪। উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত প্রকাশ পায় বৈরী শ্রেণীগুলির মধ্যে সংগ্রামে এবং তার সমাধান হয় সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে।

৫। বৈরগর্ভ সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের চালিকা শক্তি হল শ্রেণী সংগ্রাম।

বার্ভাতি মূল্যের তত্ত্ব — মার্কসবাদের আরেকটা মহান আবিষ্কার যা থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি। সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদনের জন্য প্রয়োজন ছিল একদিকে — উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালী উদ্ভবের অনিবার্যতা এবং নির্দিষ্ট একটা পর্বের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা, সুতরাং তার ধ্বংসের অনিবার্যতাও ব্যাখ্যা করা, অন্যদিকে — এই উৎপাদন প্রণালীর অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি উদ্ঘাটন করা।

মার্কস কর্তৃক বার্ভাতি মূল্যের নিয়ম আবিষ্কারকে এঙ্গেলস এইভাবে বর্ণনা করেছেন: ‘দেখানো হল যে দাম-না-দেওয়া শ্রম আত্মসাৎ করা হল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর এবং তার শ্রমিক শোষণের মূলগত রূপ; এমনকি পণ্য হিশেবে পণ্যের বাজারে শ্রমশক্তিকে পুঁজিপতি যখন কেনে পূর্ণ মূল্যেই, তখনো তার জন্য সে যা শোধ দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি মূল্য সে আদায় করে নেয়, এই বার্ভাতি মূল্যটাই শেষ পর্যন্ত সেই মূল্য সমষ্টি গড়ে তোলে যা থেকে সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির হাতে অনবরত ক্রমবর্ধমান পুঁজি সঞ্চিত হতে থাকে।’* এইভাবে বার্ভাতি মূল্য হল: মজদুর-

* Marx K., Engels F. *Selected Works* in three

শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বাবদ যে মূল্য পেল অথচ সে শ্রমশক্তি খাটিয়ে তদুদ্ভূত শ্রমে যে মোট মূল্য উৎপাদিত হল, তার ভেতর শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত সেই অংশটা, পুঁজিপতি যেটা আত্মসাৎ করে বিনামূল্যেই।

বাড়তি মূল্যের উৎপাদন আর আত্মসাৎ হল পুঁজিতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম। বাড়তি মূল্যের তত্ত্ব সংরচন করে মার্কস পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের রহস্য উন্মোচিত করেন। উৎপাদনের সংগঠনে পুঁজিপতি নির্দিষ্ট একটা টাকা ব্যয় করে উৎপাদনের উপায় সংগ্রহ আর শ্রমশক্তি কেনার জন্য, উদ্দেশ্য একটা — প্রথমে খরচ করা টাকার অতিরিক্ত অর্থাৎ বাড়তি মূল্য পাওয়া। উৎপাদনের উপায় বাড়তি মূল্যের উৎস হতে পারে না, কেননা তা নতুন মূল্য সৃষ্টি করে না, কেবল নিজের মূল্য সঞ্চার করে নবসৃষ্ট দ্রব্যে। ‘শ্রমশক্তি’ রূপ পণ্যের বৈশিষ্ট্য হল শ্রমপ্রক্রিয়ায় নিজের মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য উৎপাদনে শ্রমিকের সামর্থ্য, অর্থাৎ তা বাড়তি মূল্য জোগাতে পারে। পুঁজিপতি সেটা আদায় করে যে সময়ের মধ্যে শ্রমশক্তির মূল্য পুনরুৎপাদিত হচ্ছে, তার বেশি সময় খাটতে শ্রমিককে বাধ্য করে। শ্রমশক্তির মূল্য স্থির হয় শ্রমিকের স্বাভাবিক শ্রমক্রিয়া বজায় রাখা, তার পরিবারের ভরণপোষণ, তথা শিক্ষা, বৃত্তির জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় জীবনযাত্রার উপকরণের মূল্য দিয়ে।

volumes.—Moscow: Progress Publishers, Vol. III, p. 133.

শ্রমশক্তির মূল্যের পরিমাণ বদলায় সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, এক-একটা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ, জাতীয় বৈশিষ্ট্য আর ঐতিহাসিক বিকাশের মানের ওপরও তা নির্ভর করে।

এইভাবে মজদুর-শ্রমিকের শ্রমই হল বাড়তি মূল্যের একমাত্র উৎস।

বাড়তি মূল্যের নিয়ম আবিষ্কারের ফলে মার্কসের পক্ষে সম্ভব হয় তাঁর প্রধান রচনা ‘পুঁজি’ (লেখা হয় উনিশ শতকের ৪০-এর দশক থেকে ১৮৮৩ সাল অবধি) গ্রন্থে পুঁজিতন্ত্র বিকাশের বিশ্লেষণ দেওয়া এবং কমিউনিস্ট ব্যবস্থা দ্বারা তার বৈপ্লবিক স্থানগ্রহণের অনিবার্যতা দেখানো। বাড়তি মূল্যের তত্ত্ব প্রণয়নে, পুঁজিতন্ত্রের মূলীভূত অর্থনৈতিক নিয়ম আবিষ্কারে সম্ভব হয় পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর গভীর বনিয়াদ, তার শোষণাত্মক মর্মার্থ, শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়ার মধ্যে বৈর বিরোধের কারণ উদ্ঘাটন। বাড়তি মূল্যের তত্ত্বকে লেনিন বলেছেন মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তিপ্রস্তর।

* * *

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ আর বাড়তি মূল্যের মতবাদে সম্ভব হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালী ধ্বংসের অনিবার্যতা, সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা প্রতিপাদিত করা। সমাজতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল বিজ্ঞান। এঙ্গেলস এই কথায় জোর দিয়েছেন যে ঠিক এই মুহূর্ত থেকে সমাজতন্ত্রকে দেখা

হতে থাকল ‘...কোনো একটা প্রতিভাধর মনীষার আকস্মিক উদ্ভাবন বলে নয়, ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা দুই শ্রেণী — প্রলেতারিয়েত আর বুদ্ধজোয়ার মধ্যে সংগ্রামের অনিবার্য পরিণাম হিশেবে।’*

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আরো নানা বনিয়াদী বস্তুব্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন মার্কস ও এঙ্গেলস, যেমন শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক রত, শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের তাৎপর্য; পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে যাবার জন্য উৎক্রমণমূলক পর্বের প্রয়োজনীয়তা, কমিউনিস্ট ব্যবস্থার দুই পর্যায় হিশেবে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। লেনিন মন্তব্য করেছেন যে মার্কসবাদের মতবাদে প্রধান হল ‘সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্রষ্টা হিশেবে প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকা ব্যাখ্যা।’**

শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ, সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য বিশ্ব-ঐতিহাসিক সংগ্রামে কেন ঠিক শ্রমিক শ্রেণীই নেতৃত্ব দিতে সক্ষম?

শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক-পুনর্গঠনমূলক আর সৃজনশীল ভূমিকার কতকগুলি অবজেকটিভ কারণ আছে। প্রথমত, তারা হল সমাজের প্রধান উৎপাদনী শক্তি এবং সেইসঙ্গে বুদ্ধজোয়া সমাজের সবচেয়ে শোষিত শ্রেণী। প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করে বৈষয়িক মূল্য, কিন্তু

* Ibid., p. 132.

** Lenin V. I. *Collected Works*.—Moscow: Progress Publishers, 1973, Vol. 18, p. 582.

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে তার খবরদারি করে বদর্জোয়া। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক শ্রেণীই তেমন একমাত্র শ্রেণী, উৎপাদনের উপায়ের ওপর যাদের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, তাই তাতে সামাজিক মালিকানা স্থাপনে তারা আগ্রহী। তৃতীয়ত, প্রলেতারিয়েত সব চাইতে সংগঠিত শ্রেণী। বড়ো বড়ো উদ্যোগে তার শ্রমের পরিস্থিতিই শ্রমিক শ্রেণীর পঙ্ক্তিকে করে তোলে শৃঙ্খলানুবর্তী, ঐক্যবদ্ধ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা গ্রহণে সর্বাধিক প্রস্তুত।

মার্কস ও এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন, নিবৃত্ত ও বিত্তবানদের মধ্যে সংগ্রামের শিকড় প্রোথিত তাদের মূলগত স্বার্থের আপোসহীনতায়। শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে সজ্ঞান হলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় তাদের ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের প্রেরণা: ‘নিজেরা একটা শ্রেণী’ হয়ে দাঁড়ায় ‘নিজেদের জন্যে শ্রেণী’। সংগ্রামের গতিপথে প্রলেতারিয়েত নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলে। তাদের শ্রেণী সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ হল কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক আন্দোলনে নিয়ে আসে সমাজতান্ত্রিক চেতনা, তাতে ক’রে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, অর্থাৎ প্রয়োগের সঙ্গে তত্ত্বের মিলন ঘটায়।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্ন। উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীর নিয়মবদ্ধতা নিয়ে সুগভীর গবেষণা, বদর্জোয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের যা শিক্ষা, তার সাধারণীকরণের ভিত্তিতে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রেণী

সংগ্রামের মর্মার্থ, কর্তব্য এবং তা উদ্ভবের কারণ উদ্ঘাটিত করেন। এ সংগ্রামের অনিবার্যতা আসছে বুদ্ধজোয়া সমাজের দুই মূলগত শ্রেণী, বুদ্ধজোয়া আর প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আমূল বৈপরীত্য থেকে।

মার্কসবাদের গুরুদ্বারা বলেছেন, প্রলেতারিয়েত শুধু একটা কষ্টভোগী শ্রেণী নয়, বুদ্ধজোয়া সমাজের পরিস্থিতিতে, সত্যি করেই বিপ্লবী শ্রেণী। বুদ্ধজোয়া প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম পৌঁছয় উৎপাদনের পদ্ধতিতান্ত্রিক প্রণালীর উচ্ছেদে, শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের চূড়ান্ত বিলোপের শর্ত সৃষ্টিতে। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েতকে গণ্য করেছিলেন সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিতদের স্বাভাবিক নেতা বলে। কেবল এই সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলেই গড়ে ওঠে শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা, শক্তিশালী হতে থাকে ব্যাপক অপ্রলেতারীয় জনগণের সঙ্গে তার জোট, যথা: মেহনতি কৃষক, শহুরে পেটি বুদ্ধজোয়া, বুদ্ধিজীবী, কর্মচারী। সমস্ত মেহনতির স্বার্থ প্রকাশ করে শ্রমিক শ্রেণী। শোষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে সে গোটা সমাজকেই মুক্ত করে শোষণ থেকে।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রথম কর্মসূচিগত দলিল 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তহারে' মার্কস ও এঙ্গেলস এই কথাটা প্রতিপাদিত করেন যে পদ্ধতিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব কেবল বিপ্লবের পথে। সমাজতন্ত্ররূপ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে কেবল বিদ্যমান পদ্ধতিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করে।

‘কমিউনিস্ট বিপ্লবের সামনে কাঁপুক প্রভুশ্রেণীরা।
তাতে প্রলেতারিয়েতের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু
নেই। জয় করবার জন্য আছে সারা জগৎ।’*

‘কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারের’ সবখানি জুড়ে আছে
প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের ধারণা, যা মার্কসবাদের
একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য। ‘প্রলেতারিয়েতের
একনায়কত্ব’ কথাটা ব্যবহার না করলেও মার্কস ও
এঙ্গেলস মেলে ধরেছেন তার মর্মার্থ, বলেছেন যে
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম কাজই হল
প্রলেতারিয়েতকে প্রভু শ্রেণীতে পরিণত করা।

এ গ্রন্থে ধ্বনিত হয়েছে তাঁদের মহান আহ্বান
‘দুনিয়ার মজদুর এক হও!’ তাতে প্রকাশ পেয়েছে
প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মূলনীতি —
আন্তর্জাতিক একাত্মতা। পুঁজি একটা আন্তর্জাতিক
শক্তি, তার প্রভুত্ব উচ্ছেদ করার জন্য প্রয়োজন
শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক মৈত্রী, কর্মের ঐক্য।

সমস্ত দেশের শ্রমিকদের কাছে নতুন, ন্যায়পরায়ণ
সমাজ নির্মাণের কর্তব্যটাও একই। কমিউনিস্ট
সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে
মার্কসের মতামত দেওয়া হয় তাঁর ‘গোথা কর্মসূচির
সমালোচনায়’ (১৮৭৫), সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় তাতে
ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থার মূলকথা বলা হয়েছে।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম বিষয়ে মার্কসের ধারণা

* Marx K., Engels F. *Collected Works*.—Moscow: Progress Publishers, 1976, Vol. 6, p. 519.

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যন্দৃষ্টির দৃষ্টান্ত। যেহেতু এটা বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি, তাই প্রশ্ন ওঠে: ভবিষ্যৎ সমাজের চরিত্র বর্ণনায় মার্কস নির্ভর করেছিলেন কোন বাস্তব ঘটনার ওপর? বুদ্ধিজীবীরা ভাবাদর্শীরা এই দাবি করে যে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য হল একধরনের ইউটোপিয়া, কোনো বাস্তবতার প্রতিফলন নেই তাতে। ‘রাষ্ট্র ও বিপ্লব’ গ্রন্থে (১৯১৮) লেনিন তার এই জবাব দিয়েছেন: মার্কসের ছিল ‘দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত তথ্য’ যাতে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার মূলকথাটা বিচার করা সম্ভব। নতুন ব্যবস্থাটা ‘আগছে পুঁজিতন্ত্র থেকে, ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র থেকে, এমন একটা সামাজিক শক্তির দ্বিয়ার তা ফল, যার জন্ম দিয়েছে পুঁজিতন্ত্র।’* নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূলগত, মর্মার্থসূচক দিকগুলি মার্কস নিষ্কাশিত করেছেন পুঁজিতান্ত্রিক বৃহৎ শিল্পোৎপাদনের অবজেকটিভ প্রবণতা থেকে, যথা — শ্রম ও উৎপাদনের সর্বাঙ্গীণ সামাজীকরণ। তিনি লিখেছেন, ‘উৎপাদনের উপায়ের কেন্দ্রীভবন ও শ্রমের সামাজীকরণ এমন একটা মাত্রায় পৌঁছায় যে নিজের পুঁজিতান্ত্রিক খোলায় তা আর আঁটে না। খোলা ফেটে যায়। মৃত্যুঘণ্টা বাজে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানার।’**

* Lenin V.I. *Collected Works*.—Moscow: Progress Publishers, 1977, Vol. 25, p. 463.

** Marx K., Engels F. *Capital*, Vol. I.—Moscow: Progress Publishers, 1984, p. 715.

নতুন সমাজব্যবস্থার এই হল তাত্ত্বিক পূর্বশর্ত। শ্রম ও উৎপাদনের সর্বাঙ্গীণ সামাজীকরণের যে নিয়ম, তার চূড়ান্ত আশ্রয়প্রকাশ থেকে মার্কস তার সম্ভবপর সমস্ত পরিণাম নির্ধারণ করেছেন, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের ছবি দিয়েছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের যুগে কি নতুন সমাজব্যবস্থাকে তার সমস্ত প্রত্যক্ষতায় কল্পনা করা, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়া যেত? অবশ্যই না: তদনুযায়ী অস্তিত্বের মালমশলা ছিল না। মার্কসও তেমন মূর্ত-নির্দিষ্টতার দাবি করেন নি। কথাটা ছিল কেবল সবচেয়ে সাধারণীকৃত আকারে প্রশ্নটার সমাধান নিয়ে।

‘গোথা কর্মসূচির সমালোচনায়’ সমাজতন্ত্রের যে তাত্ত্বিক ছবি মার্কস দিয়েছেন, সেটা কোনো একটা দেশের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও জাতীয়-ভৌগোলিক পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়; তাতে রাষ্ট্রগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মানে বিভিন্নতার হিসেব নেওয়া হয় নি, কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় সমাজতন্ত্রের এবং খাস কমিউনিজমের পরিপক্বতার বিভিন্ন ধাপ ভাগ করা হয় নি। মার্কসীয় ভবিষ্যদ্বাণীটির এই ‘সীমাবদ্ধতাতেই’ নিহিত তার সার্বিকতার, সর্বত্র প্রযোজ্যতার লক্ষণ। এঙ্গেলস তাঁর ‘অ্যান্টি-ড্যুরিং’ গ্রন্থে (১৮৭৬-১৮৭৮) মার্কসীয় মতবাদকে গৃহীয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও ইতিহাস নিয়ে একটি বিশেষ অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করেছেন।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও

এঙ্গেলস কেবল তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের অনিবার্য ধ্বংস এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা প্রমাণের কর্তব্যই নেন নি, নিজেদের শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে কার্যক্ষেত্রে সংগ্রাম সংগঠনে সাহায্যও করেছেন শ্রমিক শ্রেণীকে। মার্কস ও এঙ্গেলসের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'কমিউনিস্ট লীগ' (১৮৪৭-১৮৫২)। ইতিহাসে এইটাই প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন। এঙ্গেলসের সঙ্গে একত্রে মার্কস লেখেন 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' যা হয়ে দাঁড়ায় বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মসূচিমূলক দলিল। প্রলেতারিয়েতের প্রথম গণচরিত্রের আন্তর্জাতিক সংগঠন — প্রথম আন্তর্জাতিকেরও (১৮৬৪-১৮৭৬) প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস।

১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনকে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস বলে অভিনন্দিত করেন মার্কস, সবদিক থেকে তাকে সাহায্যের ব্যবস্থা করেন আর তার পতনের পর তার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করেন 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' (১৮৭১) গ্রন্থে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁর সমকালীন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে এঙ্গেলসও বিপুল প্রভাব ফেলেন। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের আয়োজনে নেতৃত্ব করেন তিনি, তাতে গঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক, সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির এই আন্তর্জাতিক সংঘ মার্কসবাদের নেতৃত্ব স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন এঙ্গেলস।

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রণয়ন করেছেন সমাজতন্ত্রের সত্যকার বৈজ্ঞানিক মতবাদ, যা হল বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও কর্মসূচি।

৩। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকাশে লেনিনীয় পর্যায়

মার্কস ও এঙ্গেলসের যে মতবাদ তার উত্তরসাধক হলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪)। মার্কসের পর মদ্রুস্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর মতো বিরাট পদরূপ আগে আর দেখা যায় নি। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল মার্কসবাদের বিশুদ্ধতার জন্য, সমগ্র মেহনতি মানবজাতির সুখের জন্য আপোসহীন সংগ্রামের আদর্শ।

লেনিনবাদ বেড়ে ওঠে মার্কসীয় তত্ত্বের শোধনবাদী ও মতান্তর বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, তা হল মার্কসবাদের প্রত্যক্ষ অন্তর্ভুক্ত ও তার ইতিহাসে নতুন পর্যায়, শুদ্ধ রূপ নয়, সমগ্র বিশ্ব সংস্কৃতিতেই তা এক মহৎ অবদান। মার্কসবাদ থেকে বিকশিত হয়ে লেনিনের ধারণা নতুন ঐতিহাসিক যুগের বিস্তৃত বাস্তবতায় শিকড় নামায় এবং তার আবেদন থাকে শুদ্ধ রাশিয়া নয়, সমগ্র মানবজাতির কাছে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব বিকাশে লেনিনীয় পর্যায় জড়িত সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে অভিজ্ঞতা, তার সাধারণীকরণের সঙ্গে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, পুঞ্জিতন্ত্র থেকে মানবজাতির সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এবং কমিউনিস্ট

সমাজ নির্মাণের মূর্ত-নির্দিষ্ট নিয়মবদ্ধতা নির্ণয়ের সঙ্গ্রে। লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগ, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির বিজয়ের যুগ, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে মানবজাতির উত্তরণ যুগের মার্ক্সবাদ।

নিজের রচনাদিতে, বিশেষ করে 'সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থে (১৯১৬) লেনিন দেখান যে উনিশ শতকের শেষে আর বিশ শতকের গোড়ায় পুঁজিতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, তা প্রবেশ করেছে তার সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায়, সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়। সাম্রাজ্যবাদের মূলীভূত লক্ষণগুলি দেখিয়ে তিনি নির্দিষ্ট করেন তার মূলগত বিরোধ — এগুলি হল শ্রম আর পুঁজির মধ্যে, উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে বিরোধ। মর্শ্চিমের 'বৃহৎ শক্তি' কতৃক দুনিয়ার অন্য সমস্ত জাতিকে পদানত করায় অনিবার্যই বৃদ্ধি পায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির প্রলেতারিয়েত আর উপনিবেশগুলির জনগণ। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিতন্ত্রের বিরোধগুলিকে শেষ প্রান্তে, চরম সীমায় পৌঁছে দেয়, যার পরে শূন্য হয় বিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিতন্ত্রের শেষ পর্যায়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল।

সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নকে লেনিন উপস্থিত করেন নতুনভাবে। প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে মার্ক্স ও এঙ্গেলস মনে করেছিলেন যে সমাজতন্ত্র

বিজয় লাভ করতে পারে কেবল সমস্ত অথবা বেশির ভাগ অগ্রণী পুঁজিতান্ত্রিক দেশে একই সময়ে, কেননা পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ যখন উদীয়মান, সে সময় আলাদা কোনো একটা দেশে বিপ্লব অন্যান্য দেশের পুঁজিপতিদের মিলিত প্রয়াসে অনিবার্যই দমিত হত। প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতায় সেটা সমর্থিত হয়।

লেনিন দেখালেন যে সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে বিকাশ চলে অতিমাত্রায় অসমানভাবে, লাফ দিয়ে। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে, তাতে দুর্বল হয়ে পড়ে সাম্রাজ্যবাদের শক্তি। সেই কারণে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদের ফ্রণ্টকে কোনো একটা জায়গায় বা কয়েকটা জায়গায় বিদীর্ণ করা সম্ভব, প্রথমে কয়েকটা দেশে, এমনকি, আলাদাভাবে একটা মাত্র পুঁজিতান্ত্রিক দেশেও সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব, আর একই সঙ্গে সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব। এই সিদ্ধান্ত লেনিন করেছিলেন ‘ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র স্লোগান প্রসঙ্গে’ (১৯১৫) এবং ‘প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুদ্ধবিষয়ক কর্মসূচি’ (১৯১৬) প্রবন্ধে। এটা ছিল মার্কসবাদের সৃজনী বিকাশের নিদর্শন, বড়ো রকমের একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

মার্কসের ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করে, নতুন পরিস্থিতিতে তাঁর পদ্ধতি সৃজনী প্রয়োগ করে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের পর্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশের পথ উদ্ঘাটিত করেন, বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল রচনা করেন, প্রতিপাদন করেন অনেক

নতুন কথা, যেমন ন্যায়ের সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যের মিলন, বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বহুবিধ রূপ, প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক জোটের মতবাদ দেন তিনি, প্রলেতারিয়েতের সহযোগী হিসেবে কৃষকদের ভূমিকা দেখান; একই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মিলন, সে সংগ্রামে পার্টির ভূমিকার কথা বলেন। জাতীয় প্রশ্নকে লেনিন গণ্য করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা অঙ্গীয় অংশ বলে, তার পরিপূর্ণ সমাধান সম্ভব কেবল সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে, আগেকার সমস্ত নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর স্বাধীন জাতীয় বিকাশের শর্তে। এই প্রশ্নগুলি লেনিন আলোচনা করেন ‘জাতীয় সমস্যা সমালোচনামূলক মন্তব্য’ (১৯১৩), ‘জাতিসমূহের আত্মনির্ধারণের অধিকার’ (১৯১৪), ‘শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় প্রশ্ন’ (১৯১৩) প্রভৃতি রচনায়।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও মুক্তি আন্দোলনের কাছে বিপুল তাৎপর্য ধরে পশ্চিম ও পূর্বের বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে পার্থক্য তার অনুপস্থিতি হিসেবে নেওয়া, সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও উপনিবেশের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে জোট, বিকাশের অপূর্জিতান্ত্রিক পথের সম্ভাবনা বিষয়ে লেনিনের প্রস্তাব।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের যে অভিজ্ঞতা, তার সাধারণীকরণ প্রসঙ্গে

লেনিন এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত টানেন যে আন্তর্জাতিক পরিসরে রুশ বিপ্লবের কতকগুলি প্রধান দিক, যেমন সর্বাপ্রাে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, কৃষক ও অন্যান্য অপ্রলেতারীয় স্তরের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জোট, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বমিকার পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। এই নিয়মবদ্ধতাগুলি সমর্থিত হয়েছে অন্যান্য দেশে পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির অভিজ্ঞতায়। অক্টোবর বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হবার পর লেনিন হাজির করেন সমাজতন্ত্র নির্মাণ পরিকল্পনার মূলকথাগুলি, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ব্যবহারিক পথ ও পদ্ধতি চিহ্নিত করেন, প্রণয়ন করেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলসূত্র।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিজয়ের জন্য শ্রমের উৎপাদনশীলতার সমৃদ্ধ বৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করেছিলেন লেনিন। শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার এবং শিল্প জাতীয়করণের পর ‘অত্যাবশ্যক হিশেবে সর্বাপ্রাে এগিয়ে আসছে পুঞ্জিতন্ত্রের চেয়ে উচ্চতর সমাজব্যবস্থা গঠনের কর্তব্য, যথা: শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সেই প্রসঙ্গে (এবং তার জন্যই) তার উচ্চতম সংগঠন।’*

রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পর শুরুর হল শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের নতুন পর্যায়,

* Lenin V. I. *Collected Works*.—Moscow: Progress Publishers, 1977, Vol. 27, p. 257.

কেননা সে বিপ্লব প্রলেতারিয়ানদের, সারা বিশ্বের মেহনতিদের বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন করে তোলায় প্রভাব ফেলে। দুনিয়ার বহু দেশেই গড়ে উঠতে থাকে কমিউনিস্ট পার্টি।

আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা ছিলেন লেনিন। তিনি ছিলেন বর্তমান কমিউনিস্ট আন্দোলনের উৎসমুখে। সুবিধাবাদে জীর্ণ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আর সক্রিয় ছিল না। বুর্জোয়ার সঙ্গে জোট বাঁধার নীতি অনুসরণের ফলে তা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে, বিশ্বাসঘাতকতা করে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ মোচন করেন লেনিন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (১৯১৪) শুরু হতেই তারা নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, হয়ে ওঠে যুদ্ধের পক্ষপাতী, আর যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই লেনিন নতুন, তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ার জন্য শক্তি সংগ্রহ করতে থাকেন।

লেনিনের উদ্যোগে গঠিত হয় তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (১৯১৯-১৯৪৩)। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসগুলিতে নেতৃত্ব দেন লেনিন, যাতে পোক্ত করা হয় তার ভাবাদর্শীয় ও সাংগঠনিক বিনিয়াদ।

লেনিনের কথায়, 'প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের জন্য প্রলেতারীয়, আন্তর্জাতিক সংগ্রামের ভিত্তি পত্তন করে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ছিল একসারি দেশে

আন্দোলনের ব্যাপক গণপ্রসারের জন্য ভিত্তি প্রস্তুতির যুগ।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাজকর্মের ফল গ্রহণ করেছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক, তার সুবিধাবাদী, সোশ্যাল-শোভিনিস্ট, বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মালিন্য ছেঁটে ফেলে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কার্যকৃত করতে শুরুর করেছে।*

* * *

মার্কসবাদের মতবাদে লেনিন নিজে যে অবদান যোগ করেছেন তাতেই লেনিনবাদের তাৎপর্য ফুরিয়ে যায় না। মার্কসবাদের প্রতি সৃজনধর্মী মনোভাবের দৃষ্টান্ত রেখেছেন লেনিন, পরিবর্তমান অবজেকটিভ বাস্তবতার সুগভীর জ্ঞানের জন্য মার্কসবাদের ভাবাদর্শীয় সম্পদ সম্ব্যবহারের নিদর্শন দেখিয়েছেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ — সমাজতন্ত্র বিষয়ে কার্ল মার্কস, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের যে মতবাদ, তার বিকাশে বিপুল অবদান রাখছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ভ্রাতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টিরা, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন। বর্তমান কালের ঘটনাদি ও সমস্যার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে নির্ণীত হয়েছে বর্তমান

* Lenin V. I. *Collected Works*.—Moscow: Progress Publishers, 1977, Vol. 29, p. 307.

যুগের বিজ্ঞানসিদ্ধ বিশেষত্ব। সাম্প্রতিক পুঞ্জিতন্ত্রের বিকাশে নতুন নতুন ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের যে সাধারণ নিয়মবদ্ধতাগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা আবিষ্কার করে গেছেন, সেগুলি গুঁড়িয়ে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশের পথ, ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ ও অশান্তিপূর্ণ রূপ সঠিকভাবে মেলাবার প্রশ্ন বিচার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা বিকাশের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা, নির্ণীত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মূলনীতি, তাদের সহমিতালির যৌথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথ নির্দিষ্ট হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের জগৎ হল ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া, গতিশীলভাবে বিকাশমান একটা সামাজিক ঘটনা। বাস্তব জীবন তার সামনে ক্রমাগত উপস্থিত করছে নতুন নতুন কর্তব্য আর সমস্যা, যা দাবি করে প্রগাঢ় অনুধাবন আর তাত্ত্বিক সাধারণীকরণ। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন প্রদত্ত বনিয়াদি ভাবনাদি অবলম্বনে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি জবাব দিচ্ছে জরুরি বাস্তব প্রশ্নের, বর্তমান কালের ঘটনা ও সমস্যায় প্রয়োগ করে বিকশিত করে তুলছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ।

সমাজতন্ত্রের যে মতবাদ, নিরন্তর তার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে, বাস্তব সমাজতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব ও আত্মপ্রতিষ্ঠায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাস্তব সমাজতন্ত্র

১। সমাজব্যবস্থা হিঁশেবে সমাজতন্ত্র

বাস্তব সমাজতন্ত্রের সূত্রপাত করে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব। বাস্তব জীবন সন্দেহাতীত রূপে দেখিয়েছে নতুন সমাজব্যবস্থার প্রাণবন্তা শক্তি। আজকের সমাজতন্ত্র হল মেহনতিদের স্বার্থে পরিপক্ক অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা সাফল্যের সঙ্গে সমাধানের দৃষ্টান্ত। সমাজতন্ত্র অবিরাম প্রসারিত করছে তার সীমান্ত। ক্রমেই নতুন নতুন জনগোষ্ঠী সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে নামছে। নতুন সমাজব্যবস্থা গড়া ও সদুসম্পূর্ণ করার সাতিশয় বহুমাট্রিক অভিজ্ঞতা পাওয়া যাচ্ছে বর্তমানের বাস্তব সমাজতন্ত্র থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তাতে পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরিত্র বিষয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গুরুদ্বয়ের নীতিগত প্রস্তাব।

পুঞ্জিতন্ত্রে প্রস্তুত ভিত্তির ওপর সমাজতন্ত্রের জন্ম। বিভিন্ন দেশে পুঞ্জিতন্ত্র একইরকম বৈষয়িক, রাজনৈতিক ও আর্থিক পূর্বশর্ত গড়ে না। সমাজতন্ত্রের দিকে দেশগুলি যাত্রা করে বিভিন্ন মান থেকে। সেই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে সমাজতান্ত্রিক সমাজবিকাশের একাধিক পর্যায়ের আবশ্যিকতা ও সাধারণ তাৎপর্য আছে।

নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপলাভ ও বিকাশকে পূর্বে ভাগ করার নীতিগুলি প্রণয়ন করে যান মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন। তাঁরা মনে করতেন যে সমাজকে এই পথে অনিবারণ্য যেতে হবে গৃহগতভাবে পৃথক তিনটি ঐতিহাসিক পর্যায় দিয়ে: উৎক্রমণ পর্ব, প্রথম পর্যায় — সমাজতন্ত্র, দ্বিতীয় পর্যায় — কমিউনিজম।*

মার্কসের ‘গোথা কর্মসূচির সমালোচনায়’ পুঞ্জিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটা বিশেষ পর্বের থিসিস প্রথম সূত্রবদ্ধ করা হয়। এ পর্বটা আবশ্যিক, কেননা পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যবস্থা থেকে নতুন সামাজিক ব্যবস্থা — সমাজতন্ত্রের পার্থক্য হল এই যে তা আগেকার পুঞ্জিতান্ত্রিক সমাজের গর্ভে জন্ম নেয় না। পুঞ্জিতন্ত্র কেবল সমাজতন্ত্রে যাবার বৈষয়িক শর্তাদি প্রস্তুত করে তোলে। কিন্তু উৎপাদনের প্রধান উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদের

* কমিউনিজম — লাতিন ‘communis’ (সাধারণ) শব্দ থেকে।

জন্য প্রয়োজন উৎপাদনী শক্তির আরো বিকাশ, তাদের সমাজতান্ত্রিক সামাজীকরণ, সেই সঙ্গে শোষক শ্রেণীগগুলির, সূত্রাং শ্রেণী বৈরের উৎসাদন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ চলে বদ্বর্জ্যায়ার ক্ষমতা অপসারণ আর কোনো না কোনো রূপে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পরিস্থিতিতে। শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা চলে আসায় সূচিত হয় উৎক্রমণ পর্বের সূত্রপাত। উৎক্রমণ পর্বের রাজনৈতিক মর্মার্থ হল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, আর সামাজিক-অর্থনৈতিক অন্তঃসার — সমাজে অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপের প্রসার, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের খোদ বৈষয়িক ভিত্তিটাই বিলোপ, অর্থাৎ উৎপাদনী উপায়ের সামাজীকরণ। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল শোষকদের প্রতিরোধ দমন আর সমাজতন্ত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা। মদ্বুক্ত আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় যা দেখা গেছে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব স্থাপন একটা ঐতিহাসিক আবশ্যিকতা, পদ্বিজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল সমাজতন্ত্র গঠন ও সংহতির লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণী আর সংখ্যাবহুল অন্যান্য অপ্রলেতারীয় মেহনতি স্তরগুলির একটা বিশেষ ধরনের শ্রেণী জোট। এরূপ জোট সম্ভব এবং প্রয়োজন, কারণ সমস্ত মেহনতির মৌলিক স্বার্থে মিল আছে। সমাজতন্ত্রই একচোটিয়া বদ্বর্জ্যায়ার শোষণ ও অধীনতা থেকে মদ্বুক্ত করে কৃষক, শহুরে পেটি বদ্বর্জ্যয়া, বদ্বন্ধিজীবীদেব। অন্যদিকে, শত্রু শ্রেণীগগুলির

প্রতিরোধ দমন, সমাজতন্ত্র নির্মাণ ও মজবুত করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন সহযোগীর। শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগীরা গড়ে তোলে বৈপ্লবিক ক্ষমতার সামাজিক ভিত্তি। এই শ্রেণী জোট হতে পারে কম বা বেশি প্রশস্ত, কম বা বেশি শক্তিশালী। এর ওপর এবং দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের মান, তাতে শ্রেণী শক্তিগুলির বিন্যাস, বিশ্ব মঞ্চে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের শক্তি অনুপাত, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশের শাস্তিপূর্ণ বা অশাস্তিপূর্ণ পথ, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার মাত্রা, তার জাতীয় ঐতিহ্য — এইসব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রূপ।

উৎক্রমণ পর্বে উৎপাদনী উপায়ের সামাজীকরণে বোঝায় উৎপাদনের মূল উপায়গুলির ওপর সমগ্র সমাজের মালিকানা স্থাপন, তাতে একটি সাধারণ পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদনী শক্তির বিকাশকে প্রণালীবদ্ধ করা সম্ভব হয়। উৎপাদন উপায়ের সামাজীকরণ চলে মালিকানার দুটি প্রধান রূপের মাধ্যমে: রাষ্ট্রীয় (সর্বজনীন) আর সমবায়মূলক। মালিকানার রাষ্ট্রীয় রূপ গড়ে ওঠে বড়ো বড়ো উদ্যোগ, ব্যাংক, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভূমি ইত্যাদি জাতীয়করণের ফলে। সমাজতান্ত্রিক মালিকানার সমবায়মূলক রূপ দেখা দেয় মেহনতি কৃষকদের মালিকানা একত্র ক'রে, সেই সঙ্গে অন্য যেসব মালিক জীবিকার্জন করে নিজেদের ব্যক্তিগত শ্রমে (কারুজীবী,

ছোটো দোকানদার প্রভৃতি), তাদের মালিকানা-স্বত্বকেও সম্মিলিত ক'রে।

উৎক্রমণ পর্বের চরিত্র ও অস্তিত্বকাল নির্ভর করে, শেষ বিচারে সামাজিক (সর্বাগ্রে অর্থনৈতিক) বিকাশের মানের ওপর, যেখান থেকে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। উৎক্রমণ পর্ব হল বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকার অস্তিত্ব ও সংগ্রামের কাল। এ পর্বের কাজ হল বহুরূপী অর্থনীতির অবসান ঘটিয়ে উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক প্রণালীর আধিপত্য নিশ্চিত করা। উৎক্রমণ পর্ব হল প্রভুত্বকারী মেহনতি শ্রেণীগর্ভাল আর যে শোষক শ্রেণীরা উৎখাত হলেও বিলুপ্ত হয় নি, তাদের মধ্যে তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের পর্ব। এ পর্বের কাজ হল শোষক শ্রেণীদের নিশ্চিহ্ন করা, শ্রেণী বৈর বিলুপ্ত করা, সামাজিক সম্পর্কের সমস্ত ব্যবস্থায়, আর্থিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রগাঢ় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানো।

সমাজব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের রূপলাভের ক্ষেত্রে, খাস উৎক্রমণ পর্বেই বিকাশের নির্দিষ্ট দৃষ্টি ধারা ও ধাপ পৃথক করা যায়: সার্বিক — সমস্ত দেশের পক্ষে যা অবধারিত, আর বিশিষ্ট — এক-একটা দেশ বা দেশগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসূচক। কোনো একটা দেশের অভিজ্ঞতা যদি খুব সমৃদ্ধ আর বহুমুখীও হয়, তাহলেও তা থেকে সার্বিক দিকটা স্থির করা চলে না। সার্বিক দিকটা নতুন ব্যবস্থার খোদ বনিয়াদের উদ্ভব ও বিকাশ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, সেটা হল সমাজের গোটা কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। সমাজতন্ত্রের

বিকাশে এক-একটা দেশ বা দেশগোষ্ঠীর যা বৈশিষ্ট্য, সেটা হল সাধারণ নিয়মবদ্ধতার আত্মপ্রকাশের বিশেষ রূপ।

যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিশেষ ধাপ ছিল ‘সামরিক কমিউনিজমের’ ধাপ। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে হয়েছিল যে বিশেষ পরিস্থিতিতে, সেটাই তার কারণ। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণ সবারকমে খানচাল করার চেষ্টা করে সাম্রাজ্যবাদীরা। সামরিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক অবরোধের ব্যবস্থা করে তারা, দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লবের পোষকতা করে সর্বোপায়ে। তার ওপর ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) ফলে জাতীয় অর্থনীতির অবিশ্বাস্য ভগ্নদশা, সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অভাব। পুঁজিতান্ত্রিক শত্রু পরিবেষ্টিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পের জাতীয়করণ, কৃষির যোথীকরণ, সোভিয়েত গণতন্ত্রের বিকাশে একটা বিশেষ ধরন ও গতিবেগ দেখা দেয়। একটা বিশেষ, জরুরি পলিসি অনুসরণে বাধ্য হয় সোভিয়েত রাষ্ট্র, তার নাম হয় ‘সামরিক কমিউনিজম’। তার প্রধান দিক ছিল শ্রেণী চরিত্র অনুসারে রাষ্ট্রীয় বণ্টন, বিনামূল্যে খাদ্য, শিল্পপদ্ব্য, সরকারি সার্ভিস প্রদান, ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষেধ, বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শ্রম।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎক্রমণ পর্বের মধ্যে ‘নেপ’ (নয়া অর্থনৈতিক পলিসি)-এর মতো সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের একটা পর্যায়ও পেরিয়ে আসতে হয়, তার

বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থনীতিতে প্রধান প্রধান ঘাটি প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের হাতে রেখে পুঁজিতন্ত্র অনুমোদন, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনে প্রশ্রয় দান। 'সামরিক কমিউনিজম' থেকে 'নেপ' পর্বে চলে আসার কারণ ছিল এই ঘটনাচক্র যে গৃহযুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ অবসানের পর (১৯১৮-১৯২০) 'সামরিক কমিউনিজম' দিয়ে শান্তির পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক নির্মাণের কর্তব্য সাধিত হচ্ছিল না।

উৎক্রমণ পর্বে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নে 'নেপ' পলিসির প্রভূত তাৎপর্য ছিল। হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় অল্প সময়ের মধ্যেই, চালু হয় দেশের শিল্পায়ন, যৌথ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে কৃষকদের উত্তরণ। উৎক্রমণ পর্ব সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 'নেপের' অবসান হয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'সামরিক কমিউনিজম' থেকে 'নেপের' একটা তফাৎ এই যে মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দিক থেকে একটা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পলিসি হিশেবে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও 'নেপের' একটা স্থান আছে।

উৎক্রমণ পর্বের ফল হল সমাজব্যবস্থা হিশেবে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ নির্মাণ। উৎক্রমণ পর্ব সম্পূর্ণ হলে এক-একটা দেশ প্রবেশ করে নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে, সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে।

কমিউনিস্ট ব্যবস্থার রূপলাভে সমাজতন্ত্র হল

আবশ্যিক, নিয়মসঙ্গত, এবং ইতিহাসের দিক থেকে দীর্ঘস্থায়ী একটা পর্ব। সামাজিক ব্যবস্থা হিশেবে তা হল সামাজিক সম্পর্কের আঙ্গিক গ্রন্থনের একটা ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্রের অবজেকটিভ নিয়মাদির ভিত্তিতে যা বিকাশমান। উৎপাদনী সম্পর্কের বনিয়াদের ওপর দানা বাঁধে ও বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে সামাজিক-শ্রেণীগত, রাজনৈতিক, ভাবাদর্শীয়, নৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্ক। সব মিলিয়ে তারা গড়ে তোলে নতুন সামাজিক সম্পর্কের একটা অখণ্ড তন্ত্র — সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

সমাজজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র — অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের চরিত্রসূচক, সার্বিক তাৎপর্যের দিকগুলি কী?

অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাস্তব সমাজতন্ত্র আবির্ভূত হয় উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক প্রণালী হিশেবে। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, উৎপাদনের উপায় গোটা সমাজের সম্পত্তি। উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক প্রণালীর ভিত্তি হল সমাজতান্ত্রিক মালিকানার প্রধান দুই রূপ, রাষ্ট্রীয় ও সমবায়মূলক মালিকানা, কার্যিক শ্রমের তুলনায় যান্ত্রিক শ্রমের প্রাধান্য সহ শিল্পোন্নত বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বনিয়াদ। উৎপাদনী উপায়ের সামাজীকরণের ভিত্তিতে বিলুপ্ত হয় তাদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ। শ্রমশক্তি আর পণ্য হয়ে রইল না। উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সমাজের প্রতিটি সদস্যের সম্পর্ক একইরকম। উৎপাদনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিমালিকের মুনোফা লোটা নয়, সমাজসভ্যদের

বৈষয়িক ও আর্থিক চাহিদার সর্বাধিক পূরণ (স্বভাবতই উৎপাদনী শক্তির অর্জিত মানের পরিসীমায়)। উৎপাদন চলছে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে। চালু হয়েছে সমস্ত মেহনতির কাছে শ্রম অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। উৎপাদনের পণ্যরূপ চরিদ্র বজায় আছে, কিন্তু এটানতুন ধরনের পণ্যোৎপাদন। পণ্যের উৎপাদক হচ্ছে শ্রমিক যৌথ। শ্রমকর্ম এক-একজন ব্যক্তি ও এক-একটা যৌথ প্রবৃত্ত হচ্ছে বৈষয়িক স্বার্থ ও আর্থিক প্রেরণায়। উৎপাদনের ফল বণ্টিত হচ্ছে শ্রম অনুসারে, সমাজতন্ত্রের এই নীতিতে: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে।' সমাজতন্ত্রে দেখা দেয় শ্রমের নতুন প্রেরণা: কমিউনিজমের ধ্যান-ধারণা ব্যাপ্ত হতে থাকে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে, খোদ শ্রমেই, তার মধ্যে নিহিত সৃজনশীল দিকটার বেড়ে উঠতে থাকে লোকের আগ্রহ।

সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তব সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণী বৈরের অনস্তিত্ব। সমাজের অভ্যন্তরে শ্রেণী বৈর অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈরিতাও বিলুপ্ত হয়। বাস্তব সমাজতন্ত্রের সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হল এমন সব শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের অস্তিত্ব যাদের প্রকৃতি সমাজতান্ত্রিক। সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের মার্কসীয়-লেনিনীয় পার্টি পরিচালিত মেহনতি জনের হাতে। মূলগত সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় জনগণের ব্যাপক গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের

ভিত্তিতে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক-রাজনৈতিক ঐক্য।

সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে বাস্তব সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল কতকগুলি আন্তর্জাতিক দিক, যেমন, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শ ও বিশ্ববীক্ষার প্রাধান্য, সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ স্ফূর্তিগগুলির আন্তরীকরণ, যৌথ মনোবৃত্তি, সমৃদ্ধ নৈতিক স্বেচ্ছার প্রেরণা প্রতিষ্ঠা।

সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং মানুষই বদলে যেতে থাকে। কমিউনিস্ট ব্যবস্থা বিকাশের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও নিয়ম হল মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায় হিশেবে সমাজতন্ত্র মেহনতিদের মূলগত স্বার্থ পূরণ, সমাজে মানুষের নতুন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে।

সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ গঠনের পর প্রতিটি দেশেই প্রয়োজন বিজয়ী সমাজতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করার জন্য একটা কম-বেশি দীর্ঘ পর্ব, প্রয়োজন তার নির্মাণ সম্পূর্ণ করা। শূন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে নয়, অন্য একসারি দেশেও সমাজতন্ত্র বিকাশের বাস্তব কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজতান্ত্রিক দেশের ভ্রাতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে উৎক্রমণ পর্ব, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি নির্মাণ শেষ হবার পর সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের মধ্যেই থাকে অন্তত দুটি সাধারণ তাৎপর্যের ধাপ: সমাজতন্ত্র নির্মাণের ধাপ (সমগ্রভাবে সমাজতন্ত্র নির্মাণ) আর তার সম্পূর্ণ হবার ধাপ। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে উৎক্রমণ পর্বের মোট

ফল এই দাঁড়ায় যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হয় তখনো পুরোপুরি নয়, কেবল মূলত, অর্থাৎ সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে (অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক, আর্থিক) গড়ে ওঠে তার বনিয়াদ, কিন্তু তখনো তা নিজের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ মেলে ধরে নি। ইতিমধ্যে বিজয়ী সমাজতন্ত্র যাতে পরিণত হয় একটা অখণ্ড, পরিকল্পিতরূপে সক্রিয় দেহসত্তায়, যাতে সমাজতন্ত্রের সমস্ত নিয়ম ও নীতি কার্যকরী হবার পূর্ণ পরিসর পাচ্ছে, তার জন্য নির্দিষ্ট একটা সময় প্রয়োজন। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির অধিকাংশ দেশ সমাজতন্ত্র নির্মাণের ধাপ দিয়ে যাচ্ছে।

পূর্জিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ একটা আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া। সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্র একই সময়ে সমস্ত দেশে জয়লাভ করতে পারে না। তার বিজয় হয় প্রথম দিকে একটা কিংবা কতিপয় দেশে। পৃথক একটা দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ে পূর্জিতান্ত্রিক দেশগুলির বর্জ্যেয়ারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দমন করতে, চূর্ণ করতে চেষ্টা করে। তাই পৃথকভাবে, একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভাবনার প্রশ্ন, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে বর্জ্যেয়া ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে গ্যারান্টির প্রশ্ন, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রশ্নটা বিশেষ তীব্রতা লাভ করে।

সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয় পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিজয় বলতে যেখানে বোঝায় দেশের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের বিজয়, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় বলতে

সেক্ষেত্রে বোঝায় বহিঃপরিস্থিতির দিক থেকে সমাজতন্ত্রের অমোঘতা, অটল অবস্থান, অর্থাৎ বিশ্ব রণাঙ্গনে শ্রেণী শক্তির এমন বিন্যাস যাতে বাইরে থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বিশ্ব রণাঙ্গনে শক্তি অনুপাতের আমূল পরিবর্তন ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পর সমাজতন্ত্রের অনুকূলে। এতে সাহায্য হয় গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি ঘটনায়: সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাক্রম বৃদ্ধি (শিল্প ও কৃষির, বিজ্ঞান ও টেকনিকের বিকাশে সাফল্য, দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের প্রবলতা), বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ, সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন। মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে মিলে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির শক্তি এমন স্তরে পৌঁছেছে যে সমাজতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করার, ঐতিহাসিক বিকাশের অগ্রগতি ঠেকাবার মতো শক্তি বিশ্বে আর নেই।

কমিউনিজমের দিকে সমাজের এগিয়ে যাওয়ার পথে একটা সার্বিক তাৎপর্যের পর্যায় হিশেবে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সর্বাপ্রাণে এই যে এই পর্যায়ের কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্র তার সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব আর সুবিধা, তার প্রগাঢ় মানবিক মর্মার্থ উন্মোচিত করে। তবে সমাজতন্ত্রকে সুসমাপ্ত, সমাজতন্ত্রের পর্বে সমাজের আদর্শ একটা অবস্থা বলে গণ্য করা অনুচিত। এই সমাজের বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক, ভাবাদর্শীয় — সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে, খোদ মানুষের অবস্থায়, তার জীবনধারায় নতুন নতুন প্রক্রিয়া।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুশাখাবিশিষ্ট একক জাতীয় অর্থনৈতিক কমপ্লেক্স গঠন যার উৎপাদনী-টেকনিকাল সম্ভাব্যক্ষমতা বিপুল, উৎপাদনী শক্তির গুণগত পুনর্গঠনে উত্তরণ। এমন বিপুল অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সম্ভাব্যক্ষমতা এদেশের আগে কখনো ছিল না; ছিল না সৃষ্টিপূর্ণ কর্মীর এমন বিপুল বাহিনী। সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি তার সামাজিক উৎপাদন বিকাশের, বৈষয়িক-টেকনিকাল ভিত্তির এমন মান অর্জন করতে পারে যখন সম্ভব হল জনগণের জীবনযাত্রায় বৈষয়িক সচ্ছলতা আর সাংস্কৃতিক মানের রীতিমতো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক পলিসিতে এ কর্তব্যকে কেন্দ্রীয় ও দীর্ঘমেয়াদী রণনীতি হিসেবে গ্রহণ। সোভিয়েত সমাজের বর্তমান পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল বৈষয়িক উৎপাদন সামাজীকরণের তীব্র বৃদ্ধি, তার পুঞ্জীভবন ও কেন্দ্রীভবনের প্রখরতা, যৌথখামারগুলির সম্প্রসারণ; শিল্পোৎপাদনের পুঞ্জীভবনে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের প্রথম একটি স্থানে।

সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সমাজের চরিত্রলক্ষণ হল সামাজিক সমরূপিতার পথে নতুন ধাপ। সমাজতন্ত্রের সামাজিক কাঠামোর বিশেষত্ব তার তেমন বিকাশে যখন একদিকে বেড়ে ওঠে শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালক ভূমিকা, অন্যদিকে চলতে থাকে কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাদের নৈকট্যের প্রক্রিয়া, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ, ভাবাদর্শের ভিত্তিতে তাদের সাধারণ দিকগুলির প্রসার। আরো কাছাকাছি আসতে থাকে

শহর আর গ্রাম, মানসিক আর কায়িক শ্রম, শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপেরা, বহুজাতিক এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চোঁহাঁদির মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও জাতিসত্তারা, যার ফলে গড়ে উঠেছে ও সংহত হয়েছে লোকেদের এক নতুন ঐতিহাসিক মেলবন্ধন — সোভিয়েত জনগণ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের চারিত্রলক্ষণ হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র থেকে সর্বজনীন রাষ্ট্রে পরিণতি। এ প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণীকরণের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র আরো অব্যাহত হতে থাকে।

ভাবাদর্শীয় ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল বিপুল অগ্রগতি। সমাজ আরো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ভাবাদর্শে, শ্রমিক শ্রেণীর ভাবাদর্শ হিসেবে যে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রাথমিক পর্বেই হয়ে উঠেছিল প্রভুত্বকারী, তা পরিণত হয়েছে সমগ্র জনগণের ভাবাদর্শে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে শ্রেণী ও সমস্ত সামাজিক গ্রুপ পরস্পর কাছাকাছি এসে গেছে।

এ কথার সারিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন যে সমাজতন্ত্রের লক্ষণ শুধু কোনো একটা দেশে নতুন ব্যবস্থার পরিপক্বতাই নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরেও তা নির্ভরশীল। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণীকরণ, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভূতির সঙ্গে, ভ্রাতৃস্থানীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির

সাথে রাজনৈতিক, ভাবাদর্শীয় আর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিগত লক্ষ্য, তার বর্তমানের রণনৈতিক কর্তব্য হল সমাজতন্ত্রের পরিকল্পিত ও সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণকরণ, দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরনের ভিত্তিতে কমিউনিজমের দিকে সোভিয়েত সমাজের অগ্রগমন। এ ছাড়া কমিউনিজমে যাবার অন্য কোন পথ নেই। তাই সমাজতন্ত্রের সর্বোচ্চ, সর্বাধিক কঠোর ধারণা অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি আজ সোভিয়েত সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। সমাজতান্ত্রিক ভাবনাকে পুরোপুরি বাস্তবে রূপায়িত করা — এইখানেই নিহিত সোভিয়েত ইউনিয়নে গঠিত সমাজতান্ত্রিক সমাজকে কার্যত সম্পূর্ণ করার সমস্ত জটিলতা আর গভীরতা।

অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে সমাজতন্ত্রের বিকাশ, সম্পূর্ণকরণের কাজটা তার বনিয়াদ গঠনের চেয়ে কম জটিল আর দায়িত্বপূর্ণ নয়। সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা জানা আর কাজে লাগানোই তো হল একই সময়ে কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতিও।

একই কমিউনিস্ট ব্যবস্থার পর্যায় হল সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম। দুই পর্যায়েই সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিতটা একই — উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা। কিন্তু শ্রমের চরিত্র, বণ্টনের ধরনে তারা পৃথক, যা শেষ বিচারে নির্ধারিত হয় উৎপাদনী শক্তির বিকাশের বিভিন্ন মাত্রায়।

সমাজতন্ত্রে পরিপূর্ণ সামাজিক সমতা তখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। শ্রম তখনো মানসিক ও কার্যিক, শিল্প ও কৃষি, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমে বিভক্ত। এই ঘটনাচক্র থেকেই দেখা দেয় সমাজের অসমরূপিতা, শ্রেণী (শ্রমিক, কৃষক) ও সামাজিক স্তরের (বুদ্ধিজীবী) অস্তিত্ব।

সামাজিক অসমতা পুরোপুরি দূর করা সম্ভব শ্রেণীগত ও সামাজিক পার্থক্য দূর হলে। যতদিন তা বজায় থাকছে, কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় ততদিন পূর্ণ সমতা দিতে পারে না: পার্থক্য থেকে যায়।

‘কাজ অনুসারে’ (প্রয়োজন অনুসারে নয়) ভোগ্য দ্রব্য বণ্টনের মধ্যে যে অন্যায়তা থেকে যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ সেটা দূর করতে সমাজতন্ত্র অক্ষম। শ্রম অনুসারে বণ্টন হল অসমান ব্যক্তিদের (সামর্থ্য, পারিবারিক অবস্থায় পৃথক) ক্ষেত্রে সমান মাপকাঠির প্রয়োগ। এইসব একত্রে ধরলে এইটে পূর্বনির্ধারিত হয়ে যায় যে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার এই পর্যায়ে পরিপূর্ণ সামাজিক সাম্য নিশ্চিত হতে পারে না।

কমিউনিজম হল নতুন সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক পরিপক্বতার অনেক উচ্চ ধাপ। এটা হল শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা, তাতে থাকে উৎপাদনের উপায়ের ওপর একই সর্বজনীন মালিকানা, সমস্ত সমাজসভ্যদের পরিপূর্ণ সামাজিক সমতা, যেখানে লোকেদের সর্বোচ্চ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবিরত বর্ধমান বিজ্ঞান ও টেকনিকের ভিত্তিতে উৎপাদনী শক্তিও বেড়ে ওঠে, সামাজিক সম্পদের সমস্ত উৎস

থেকে পূর্ণবেগে ঝরতে থাকে স্রোত এবং কার্যকৃত হয় এই মহান নীতি: ‘প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুসারে।’ কমিউনিজম হল মনুষ্য ও সচেতন শ্রমরতদের উচ্চসংগঠিত সমাজ, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক আত্ম-পরিচালন, সমাজের কল্যাণে শ্রম হয়ে দাঁড়াচ্ছে সকলের কাছে জীবনের প্রথম প্রয়োজন, সচেতন আবশ্যিকতা, প্রত্যেকের সামর্থ্য প্রযুক্ত হচ্ছে জনগণের সর্বাধিক উপকারে।

পূর্ণ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে উৎপাদন শক্তির, বৈজ্ঞানিক ও আত্মিক উৎপাদনের (স্বয়ংক্রিয়তা, সাইবারনেটিক যোজনা) সর্বোচ্চ বিকাশের ওপর। শ্রম হবে মনুষ্য, সৃজনী ক্রিয়াকলাপ, মানুষের প্রথম চাহিদা। কার্যকৃত হচ্ছে পরিপূর্ণ সামাজিক সমতা। ক্রমশ ঝরে পড়ছে রাষ্ট্রপাট, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সামাজিক আত্মপরিচালন। বিপুল বিকাশ লাভ করছে আত্মিক সংস্কৃতি। বাস্তব হচ্ছে কমিউনিজমের সর্বোচ্চ লক্ষ্য — মানুষের সর্বাঙ্গীণ সুসমঞ্জস বিকাশ।

২। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারিত হয় উৎপাদন সম্পর্ক দিয়ে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও পরিভোগ প্রক্রিয়ায় লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক দিয়ে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার নির্দিষ্ট রূপ, তা দিয়ে

আবার নির্ধারিত হয় সমাজে শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপগুলির মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সূচিত হয় সামাজিক বিকাশের মান, রাজনৈতিক ও ব্যবহারশাস্ত্রীয় উপরিকাঠামোর সঙ্গে তা নির্ধারণ করে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা। জাতীয় অর্থনীতির সর্ব শাখায় যান্ত্রিক শ্রমের প্রাধান্য সহ শক্তিশালী শিল্প রূপে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল ভিত্তি থাকে সমাজতন্ত্রের।

বহু যান্ত্রিক শিল্পোৎপাদন দেখা দেয় পুঁজিতন্ত্রেই। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের বিরুদ্ধে থাকে তার ফলের ব্যক্তিগত আত্মসাৎকরণ। উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা হয়ে দাঁড়ায় সমাজের উৎপাদনী শক্তির আরো বিকাশের পক্ষে বাধা। এই বৈর-বিরোধের সমাধান হতে পারে কেবল উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীর উচ্ছেদে।

সমাজতান্ত্রিক সামাজীকরণের পূর্বশর্ত গড়ে দেয় পুঁজিতন্ত্রেই। উৎপাদনকে তা নিয়ে আসে সর্বাঙ্গীণ সামাজীকরণে। কিন্তু উৎপাদনের হাতিয়ার আর উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই সত্যকার সামাজিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম।

উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত হয় জাতীয়করণের, অর্থাৎ জনগণের

মালিকানায় এগুণির হস্তান্তরে। সমাজতান্ত্রিক জাতীয়করণ পরের সম্পত্তি হরণ নয়। বৈষয়িক সম্পদ তা ফিরিয়ে দেয় তাদের, যারা নিজেদের শ্রমে তা সৃষ্টি করেছে।

১৯১৭ সালের অক্টোবরে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর সোভিয়েত ক্ষমতা প্রথম যে ডিক্রি জারি করে তা হল শান্তি আর ভূমির ডিক্রি। সমস্ত জমি বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রের সম্পত্তি করা হয় এবং বিনা মূল্যে চিরকালের মতো ব্যবহারের জন্য তা দিয়ে দেওয়া হয় কৃষকদের।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংক জাতীয়কৃত করা হয়। সমস্ত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ। পরে নৌবহর, তৈল ও খাদ্য শিল্পের জাতীয়করণ হয়, বহির্বর্গাজ্যের ওপর স্থাপিত হয় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া, জাতীয়করণ হয় খনি, লৌহ ও লৌহ প্রসেসিং শিল্প, সূতাকল এবং গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য শিল্প শাখার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পর ইউরোপে, যেসব সমাজতান্ত্রিক দেশ দেখা দেয়, সেখানে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে অন্যভাবে। সেখানে বিনা ক্ষতিপূরণে জাতীয়কৃত হয় শূদ্ধ সেইসব সম্পত্তি যার মালিকেরা সহযোগিতা করেছিল ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে। বাকি সমস্ত সম্পত্তি জাতীয়কৃত হয় ক্ষতিপূরণ দিয়ে।

এইসব দেশে বিকাশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের দরুন জাতীয়কৃত হয় কেবল বৃহৎ জমিদারি জমি। জমির

ওপর কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকে।
রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ভূমিহীন কৃষকদের জমি দেওয়া
হয় সামান্য অথবা বিনা মূল্যে।

জাতীয়করণ দিয়ে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন
মাত্র শুরুর হয়। সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ নিয়ে প্রতিটি
দেশকে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গড়তে হয়
নতুন শিল্প ভিত্তি। বিভিন্ন দেশে তা গড়ার শর্ত এক
নয়। সেটা নির্ভর করে তাদের অর্থনৈতিক ও
টেকনিকাল মানের ওপর।

ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রথম বিজয় লাভ
করে রাশিয়ায়, টেকনিকাল দিক থেকে দেশটা ছিল
পশ্চাৎপদ, ক্ষুদ্রে চাষি অর্থনীতি নিয়ে একটি
কৃষিপ্রধান দেশ। নবীন সোভিয়েত দেশ একা
দাঁড়িয়েছিল পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে,
অসম্ভব এবং অবরোধ মারফত নতুন সমাজব্যবস্থাকে
নিশ্চিত করার চেষ্টা ছিল তারা। তাই সেখানে
সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক-টেকনিকাল ভিত্তি সৃষ্টির
নির্ধারক শর্ত ছিল সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন হল উৎপাদনের উপায়ের
ওপর সর্বজনীন মালিকানার ভিত্তিতে টেকনিকের
আধুনিক মানের উপযোগী জাতীয় অর্থনীতি গঠনে
সক্ষম বৃহৎ যন্ত্র শিল্পের বিকাশ।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পায়ন
থেকে আমূল পৃথক।

পুঁজিতন্ত্র রূপলাভ করার পর্বে শিল্পায়ন শুরুর
হয়েছিল লঘু শিল্পের বিকাশ দিয়ে। অল্প পুঁজি

লগ্নি, পুঁজি সঞ্চালনের দ্রুততা, উৎপন্নের ব্যাপক চাহিদা ও উচ্চ মুনামা উদ্যোগীদের আকৃষ্ট করেছিল লঘু শিল্পে। কেবল পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আর শেয়ার কোম্পানি দেখা দেওয়ার ফলেই শুরুর ভারি শিল্পের বিকাশ। এ পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, তাই সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের পক্ষে তা অযোগ্য।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন শুরুর ভারি শিল্পের বিকাশ দিয়ে, তার ভিত্তিতে বেড়ে উঠতে থাকে আধুনিক শিল্পের সমস্ত শাখা। তাতে নিশ্চিত হয় প্রতিরক্ষা শিল্পের বিকাশ, যা ছাড়া জনগণের বৈপ্লবিক সৃষ্টি রক্ষা করা অসম্ভব। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নে নিশ্চিত করা হয় অবিরাম টেকনিকাল অগ্রগতি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, এবং পরিণামে উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক প্রণালীর বিজয়।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে দেশের অর্থনৈতিক-টেকনিকাল পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করতে হয়েছিল। শিল্পায়নে নামতে হয়েছিল আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক অবরোধের অবস্থায়। তাই সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের জন্য সঙ্গতির উৎসের প্রশ্নটা হয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত তীব্র, তাতে প্রয়োজন ছিল বিপুল পুঁজি লগ্নির।

পুঁজিতন্ত্র ভারি শিল্পের জন্য সঙ্গতি সৃষ্টি করে মেহনতিদের শোষণের মধ্যে দিয়ে, শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদিত বাড়তি মূল্য আত্মসাৎ করে।

তাছাড়া কেবল অভ্যন্তরীণ সম্পদে সীমিত থাকতে

হয় নি পুঁজিপতিদের। বাইরে থেকে সম্পদ আহরণের পথ নিয়েছে তারা, যেমন, উপনিবেশ ও পরাধীন দেশকে লুণ্ঠন; রাজ্যগ্রাসী বুদ্ধ থেকে আদায় করা ক্ষতিপূরণ; গোলামি শর্তে বৈদেশিক ঋণ।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে এইসব উৎস ব্যবহারের কথাই ওঠে না। বৈদেশিক ঋণ পাওয়া সম্ভব ছিল না, দেশ পড়েছিল অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে। সামরিক হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয়ে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সরকার নবীন প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল অর্থনৈতিক উপায়ে। তবে শিল্পায়নের সঙ্গতি পাওয়া গেল দেশের ভেতরেই। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কঠোর মিতব্যয়, জনগণের শ্রম উদ্দীপনায় সঞ্চিত হল সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সঙ্গতি। ইতিহাসের দিক থেকে অল্প কালের মধ্যেই গড়ে উঠল শিল্পের নতুন নতুন শাখা: ট্রাক্টর, অটোমোবিল, মেশিন-টুল, বিমান, ইনস্ট্রুমেন্ট নির্মাণ ইত্যাদি শিল্প।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন সাধিত হয় খরবেগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে শিল্পোৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন উঠে যায় ইউরোপে প্রথম ও বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে। শিল্পায়নের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিণত হল পরাক্রান্ত শিল্পোন্নত শক্তিতে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পরে যেসব দেশ সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ নিয়েছে, তারা অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সাধিত করছে অনেক অনুকূল পরিস্থিতিতে। তারা নির্ভর করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য শিল্পোন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশের সর্বাঙ্গীণ সাহায্যের

ওপর। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্পায়নের ফলে গড়ে উঠেছে আধুনিক মানে জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের বৈশ্বিক-টেকনিকাল ভিত্তি।

শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধির সঙ্গে, এমন উচ্চ গুণান্বিত শ্রমিক বাহিনী সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত, যারা উৎপাদনের নতুন টেকনিক, টেকনোলজি আয়ত্ত করতে, সেইসঙ্গে শিল্প নির্মাণে নেতৃত্ব নিতে ও তা চালাতে সক্ষম।

শিল্পের সামাজিক ও টেকনিকাল পুনর্গঠনে বিদ্যুতের হয় এক-একটা শাখায় পুঞ্জিত হতে থেকে পাওয়া টেকনিকাল পশ্চাৎপদতার দায়ভাগ। সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ধান করে শিল্পোন্নত আর কৃষিনির্ভর, পশ্চাৎপদ অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য, পুঞ্জিততন্ত্রের আমলে জাতিদের মধ্যে যতরকমের অর্থনৈতিক অসমানতা দেখা দিয়েছিল তা দূরীভূত হয়।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের পরে শূন্য হয় কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন। কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সম্ভাবনা, মর্মার্থ ও পথের সন্ধান লেনিন দিয়েছেন তাঁর সমবায় পরিকল্পনায়।

কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে লক্ষ লক্ষ মেহনতির স্বার্থের প্রশ্ন এসে পড়ে, কেননা সর্বাগ্রে তাতে বোঝায় নিজস্ব শ্রমের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রে ব্যক্তিগত জোতগুলির বৃহৎ শিল্পোৎপাদনে পুনর্গঠন।

লেনিনের সমবায় পরিকল্পনায় যৌথ জোতে কৃষকদের দীর্ঘকালীন, ক্রমিক, স্বেচ্ছামূলক সম্মিলনের

ওপর ভরসা করা হয়েছে। তার জন্য সমবায়ের বিভিন্ন রূপ কাজে লাগানো প্রয়োজন। সমবায় জিনিসটো কৃষকদের কাছে বোধগম্য, তাদের ধ্যান-ধারণার কাছাকাছি। তাতে সবচেয়ে ভালোভাবে মেলে সর্বরাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে কৃষকের ব্যক্তিগত স্বার্থ। যুগ যুগ ধরে একলা একলা খাটতে অভ্যস্ত কৃষক যৌথ শ্রমে অভ্যস্ত হয় ক্রমে ক্রমে, প্রথম সে যোগ দেয় পরিভোগী সমবয়ে, পরে ঋণমূলক এবং শেষে উৎপাদনী সমবয়ে। কৃষিতে বৃহৎ যৌথ উৎপাদনের সর্বাধিকার অর্চিয়েই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। কৃষির সামাজিক পুনর্গঠন আর টেকনিকাল পুনঃসজ্জা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিজয়ের জন্য প্রয়োজন তার যান্ত্রিক ভিত্তি জোগানো। তাতে নিশ্চিত হয় সমবায়ীকরণের দ্রুতগতি।

সমাজতান্ত্রিক শিল্প উৎপাদন করে কৃষিকেন্দ্র, সার। কেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কৃষির জন্য প্রস্তুত করে গুণগত বিশেষজ্ঞ, যৌথখামারকে জোগায় বীজ, ঋণ ইত্যাদি।

কৃষির সমবায়ীকরণে দূর হয় বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক শিল্প আর ক্ষুদ্র কৃষি জোতের মধ্যে বিরোধ। কৃষি পরিণত হল বৃহৎ যান্ত্রিক উৎপাদনে, তাতে নিশ্চিত হল শহরবাসীদের জন্য খাদ্য আর শিল্পের জন্য কাঁচামাল। বৃদ্ধি পেল কৃষকদের সচ্ছলতা, দারিদ্র্য আর ভগ্নদশা থেকে চিরকালের জন্য তাদের মুক্তি দিল সমবায়। গ্রামাঞ্চলে পুর্নজিত পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ উৎস দূর হল। পুরোপুরি জয়লাভ করল সমাজতান্ত্রিক

উৎপাদনী সম্পর্ক। লেনিনের সমবায় পরিকল্পনায় চিরকেলে কৃষি সমস্যার সমাধান হল।

যেসমস্ত দেশ সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ নিয়েছে, লেনিনের সমবায় পরিকল্পনার মূলনীতিগুণিত তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেইসঙ্গে প্রতিটি দেশে অর্থনৈতিক, জাতীয় এবং অন্যান্য যেসব বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের দিক থেকে দানা বেঁধেছে, সেগুণিতও হিসেব রাখা আবশ্যিক।

সমাজতন্ত্রের পথে প্রথম অবতীর্ণ সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষি সমবায়ের ভিত্তি ছিল শ্রমের কার্যিক ও অশ্বচালিত হাতিয়ার। কিন্তু দ্রুতবর্ধমান শিল্প কৃষিকে সজ্জিত করে আধুনিক টেকনিকে।

শিল্পোন্নত দেশগুণিতে (গণতান্ত্রিক জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া) কৃষি উৎপাদন সমবায়ীকরণের আগেও সেখানে কৃষিতে আধুনিক যান্ত্রিক টেকনিক প্রযুক্ত হাছিল। কিন্তু সমবায়ীকরণ প্রক্রিয়া চলে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে জমির বেশির ভাগ ছিল রাষ্ট্রের নয়, কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এর ফলে দেখা দিল উৎপাদনী সমবায়ের ও বণ্টন নীতির অন্যবিধ, অন্তর্বর্তী রূপ। আয় বণ্টিত হতে থাকল শ্রম নয়, সমবয়ে প্রদত্ত জমির পরিমাণ অনুসারেও। বর্তমানে অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশে ক্রমেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত হচ্ছে উচ্চতম ধরনের উৎপাদনী সমবায় যা সোভিয়েত কৃষি সমবায়গুণিতর কাছাকাছি।

ঔপনিবেশিক অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করেছে, এশিয়া ও

আফ্রিকার এমন একসারি দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় সেক্টর। উৎপাদন শক্তির দ্রুতবৃদ্ধিতে সহায়তা করে তা গড়ে দিচ্ছে সমাজতন্ত্রের নির্ধারক বৈষয়িক পদবীশত।

কিন্তু শিল্পে রাষ্ট্রীয় সেক্টর গঠন আর বিদেশী একচেটিয়ার সম্পত্তি জাতীয়করণ করলেই এসব দেশের অপূর্নজিতান্ত্রিক পথে বিকাশ বোঝায় না, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন তো দূরের কথা।

ফলত, বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পরিস্থিতি একইরকম নয়। কিন্তু বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পথে অবতীর্ণ সমস্ত দেশের পক্ষেই সাধারণ প্রধান কর্তব্য হল সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক-টেকনিকাল বনিয়াদ গঠন।

সমাজতন্ত্রে বোঝায় উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক সমাজতান্ত্রিক মালিকানার প্রভুত্ব। তার অর্থ সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত সদস্যই উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমান এবং সমপরিমাণে সেগুণিলির মালিক।

শিল্প, কৃষি, পরিবহণ, জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য শাখার কর্মীরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সামাজিক উপায়গুণিলি ব্যবহার করে হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদন ফলের যৌথ মালিক।

এতে করে লুপ্ত হয় একদল লোক কর্তৃক অন্য দলকে শোষণ, দেখা দেয় সামাজিক উৎপাদনের বিকাশে মেহনতিদের মূলগত স্বার্থের ঐক্য, সাধারণত্ব। উৎপাদনের উপায়ের ওপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় লোকেদের মধ্যে বৈর ধরনের সম্পর্ক লোপ পায়,

উৎপাদনের উপায় আর পদ্ধতি, স্বেচ্ছাশ্রম শোষণের
হাতিয়ার হয়ে থাকে না। সমাজতন্ত্রে লোকেদের মধ্যে
সম্পর্ক হল সহযোগিতা, মৈত্রী আর পারস্পরিক
সাহায্যের সম্পর্ক।

সামাজিক সমাজতান্ত্রিক মালিকানা হল সমাজতান্ত্রিক
পুনর্গঠনের পাকাপোক্ত বান্যাদ। তা থাকে দুটি
রূপে: রাষ্ট্রীয় (সর্বজনীন) আর যৌথখামার-
সামবায়িক। সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে মালিকানার
প্রধান রূপ হল রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্প ও নির্মাণের
উদ্যোগগুণিলর মালিক রাষ্ট্র। ব্যাঙ্ক, সর্ববিধ পরিবহণ,
যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য উদ্যোগ, বাসগৃহ, বিদ্যালয়,
উচ্চ শিক্ষায়তন, হাসপাতাল, সংস্কৃতি ও শিল্প
প্রতিষ্ঠানও রাষ্ট্রীয়; সমস্ত ভূমি, ভূমিগর্ভ, জল, বন
রাষ্ট্রীয়, সর্বজনীন সম্পত্তি।

সমবায়-যৌথখামার মালিকানা রয়েছে কৃষি, শিকার,
কারুকর্মের উৎপাদনী সমবায়ের মালিকানা রূপে। কৃষি
সমবায় (যৌথখামার) শ্রমের হাতিয়ার ও উপকরণ, যথা
যন্ত্রপাতি, পশুপাল, উৎপাদনে ব্যবহার্য নির্মাণকর্ম ও
খুচরো জিনিসপত্র, বীজ, পশুখাদ্য ইত্যাদির অধিকারী।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মঙ্গোলিয়া ছাড়া একসারি
সমাজতান্ত্রিক দেশে ভূমি অংশত আছে সমবায়ের
মালিকানায়। পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে ভূমিতে
একব্যক্তির মালিকানা বজায় আছে।

সর্বজনীন ও সামবায়িক মালিকানা সামাজিক-
অর্থনৈতিক চরিত্রের দিক থেকে একই প্রকার, তবে

তাদের মধ্যে পার্থক্যও আছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে যেখানে উৎপাদনের উপায় সমগ্র সমাজের পরিসরে সামাজীকৃত, সেখানে সমবায়ে তা সামাজীকৃত কেবল নির্দিষ্ট শ্রম যোথের পরিসরে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি কাজ চালায় একক রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে, তাতে নির্দিষ্ট থাকে এগুলির কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ সব সূচক। সমবায় উদ্যোগ রাষ্ট্রের কাছ থেকে পায় ক্রয় সংগঠনগুলির কাছে নির্দিষ্ট দরে বিক্রয়ের জন্য ফরমাশ-পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বহু প্রশ্নে তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের কর্মীদের শ্রম অনুসারে উপার্জন নিশ্চিত হয় সমগ্র সমাজের আয় থেকে। যোথখামারীদের পারিশ্রমিক সর্বাগ্রে নিশ্চিত হয় নির্দিষ্ট কৃষি সমবায়টির নিজেদের আয় থেকে, যদিও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য একেবারে বাতিল হয় না।

সমাজতন্ত্রে সামাজিক মালিকানায় নাগরিকদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাকচ হয় না। শুধু তাই নয়, নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর তার উত্তরাধিকার রক্ষা করে রাষ্ট্র। তবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি হল তাদের ব্যক্তিগত শ্রম বারদ উপার্জন।

মেহনতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে থাকতে পারে : জীবনধারণের, ব্যক্তিগত পরিভোগের দ্রব্যাদি, বাসগৃহ, পারিশ্রমিক থেকে সঞ্চিত টাকা। নাগরিকের ব্যক্তিগত

মালিকানায় যে সম্পত্তি থাকছে, তা নিজস্ব শ্রমবাহিত
রোজগারের জন্য বা সামাজিক স্বার্থের ক্ষতি করে
ব্যবহৃত হতে পারে না।

সমাজতন্ত্রের সমস্ত দেশেই কৃষি কর্মীদের থাকে
নিজস্ব সহায়ক জোত: গবাদি পশু, হাঁসমুরগি,
পশুপালনের জন্য নির্মিত আশ্রয়, ফলবাগান, সব্জি
ভূঁই। কিন্তু সহায়ক ভূমিখণ্ডটা তার ব্যক্তিগত ব্যবহারে
থাকলেও সেটা তার নিজস্ব সম্পত্তি নয়।

সহায়ক জোতটা সামাজিক অর্থনীতির সঙ্গে
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কেননা উৎপাদনী কৃষি সমবায়
নিজের কর্মীদের জন্য জোগায় পশুখাদ্য, সব্জি ভূঁই
বা বাগানের জন্য কৃষিযন্ত্র, কেনে তার বাড়তি উৎপাদ
ইত্যাদি। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে মেটে
মানুষের ব্যক্তিগত চাহিদা, তার চরিত্র সহায়ক ধরনের।
চাহিদার মূল অংশটা মেটে সামাজিক উৎপাদন থেকে
পাওয়া আসে। এইভাবে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের
মেহনতির এবং আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি
নাগরিকের সচ্ছলতার উৎস হল শোষণমুক্ত শ্রম।

উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক সমাজতান্ত্রিক
মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয় উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজের সমস্ত সত্ত্বের সমতা এবং
শ্রমের সমানাধিকার, ব্যক্তিগত শ্রম অবদান অনুসারে
সামাজিক সম্পদে ভাগ পাবার সমান অধিকার। সামাজিক
মালিকানায় শ্রম হয়ে দাঁড়ায় সর্বজনীন এবং
অবশ্যকর্তব্য।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষের প্রতিষ্ঠা নির্ধারিত

হয় জন্মসূত্রে বা ধনের পরিমাণ দিয়ে নয়, সমাজের স্বার্থে তার ব্যক্তিগত শ্রম ও যোগ্যতা অনুযায়ী। সততাশীল শ্রম হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিটি সভ্যের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু শ্রমই হল সমাজতন্ত্রের সর্বোচ্চ কৃতিত্বও। শ্রমের অধিকার মেহনতিদের সাংবিধানিক অধিকার। তা বিধিবদ্ধ হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বনিয়াদি আইন — সংবিধানে। সংবিধানের ৪০ ধারায় বলা হয়েছে: ‘সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকের আছে শ্রমের অধিকার, অর্থাৎ শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে পারিশ্রমিক সমেত কাজ পাবার গ্যারান্টি যা রাষ্ট্র নির্ধারিত সর্বনিম্ন মানের নিচে নয়, সেই সঙ্গে নিজের প্রবৃত্তি, সামর্থ্য, ব্যক্তিগত প্রস্তুতি ও শিক্ষা অনুসারে এবং সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রেখে পেশা, কাজকর্মের ধরন নির্বাচনের অধিকার।’*

এই অধিকার বাস্তবে নিশ্চিত হয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, শ্রমের পরিকল্পিত সংগঠনে, উৎপাদনী শক্তির অবিচল বৃদ্ধিতে। ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তা, বেকার থাকার আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে অতীতের ব্যাপার। সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে সামাজিক উৎপাদনে নিজের স্থান খুঁজে পাবার সদুযোগ থাকে প্রতিটি লোকেরই।

* *Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics.*—Moscow: Novosti Press Agency Publishing House, 1982, pp. 24-25.

সমাজতন্ত্রে শ্রমের অধিকার কার্যকৃত করা সমাজের প্রতিটি সভ্যের কর্তব্য পালন থেকে অবিচ্ছেদ্য।

সংবিধানের ৬০ ধারায় বলা হয়েছে: 'সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমক্ষম প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় হল সমাজের পক্ষে হিতকর শ্রমের তন্নির্বাচিত ক্ষেত্রে সততশীল শ্রম, শ্রম-শৃঙ্খলা পালন। সমাজের পক্ষে হিতকর শ্রম থেকে বিরত থাকা সমাজতান্ত্রিক সমাজের নীতির সঙ্গে খাপ খায় না।' শ্রমে অংশগ্রহণ থেকে সরে থাকার কোনো অধিকার নেই কারো। নিজেদের শ্রমকর্তব্যে যারা তাক্ষিল্য প্রদর্শন করে, তারা সামাজিক ধিক্বারের পাত্র। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের যেকোনো ক্ষেত্রে প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত শ্রম হল জীবনযাপনের উপার্যাদির একমাত্র উৎস।

সমাজতন্ত্র কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শ্রমের অবদান নির্বিশেষে তার প্রতিটি সভ্যের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাবার মতো অবস্থায় থাকে না। ভোগ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য সেই সঙ্গে মেহনতিদের সচেতন সমৃদ্ধ মান, অর্থাৎ বিকাশের তেমন একটা মান যখন আলাদাভাবে প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমগ্রভাবে গোটা সমাজ নিজেদের স্বেবিরোচিত চাহিদা স্থির করে নেয়: বিলাস আর মাত্রাহীনতা নয়, প্রতিটি ব্যক্তি ও গোটা সমাজের সুসমঞ্জস বিকাশের জন্য যা প্রয়োজন, তেমন চাহিদা আর তার পূরণ সামাজিক বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়, কমিউনিস্ট পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। সেই জন্য সমাজতন্ত্রের যা নীতি: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে

তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে'—
এই নীতি অনুসরণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শ্রম ও
পরিভোগের মানের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে।

শ্রমকে প্রতিটি নাগরিকের জীবনের প্রাথমিক
প্রয়োজনে পরিণত করায় সাহায্য করে সমাজতান্ত্রিক
রাষ্ট্র। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবপ্রসূত উদ্দীপনাটুকু
দিরেই কেবল সমাজতন্ত্র নির্মাণ চলে না। উৎপাদনের
ফলাফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মেহনতিদের ব্যক্তিগত
বৈষয়িক ও নৈতিক স্বার্থাগ্রহ থাকা প্রয়োজন। সে
আগ্রহ দেখা দেয় ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ ও গুণ
অনুসারে বৈষয়িক সম্পদ বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতি
কার্যকৃত করায়। যে ভালো করে খাটে, অর্থাৎ সমাজের
জন্য বেশি শ্রম দেয়, সমাজের কাছ থেকেও সে পায়
বেশি।

সমাজতন্ত্রের নীতি কার্যে পরিণত করায় রাষ্ট্র
বৈষয়িক প্রেরণাকে মেলায় নৈতিকের সঙ্গে। যে নিজের
শ্রমের ক্ষেত্রে সৃজনশীল, উদ্যোগী, সে সম্মান লাভ
করে। শ্রম, বিজ্ঞান, টেকনিক, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উচ্চ
কৃতিত্বের জন্য শ্রমিক আর কৃষিকর্মী, বিজ্ঞানী আর
ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, শিক্ষক, সব ধরনের শ্রমজীবীদের
ভূষিত করা হয় অর্ডারে, সম্মানিত করা হয় খেতাব
দিয়ে।

নৈতিক প্রেরণা নির্ভর করে দায়িত্ববোধ, শ্রমে সমৃদ্ধ
কৃতিত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষার মতো ভাবাদর্শীয়
উদ্বোধনাদির ওপর। মেহনতিদের সমাজতান্ত্রিক চেতনায়
লালিত করে তোলায় সাহায্য করে এগুঁড়ি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে তার নাগরিকদের বৈষয়িক ও আর্থিক চাহিদা। সমাজতন্ত্রে সামাজিক উৎপাদনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল এই চাহিদা মেটানো।

সমাজতন্ত্রে উৎপাদন আর পরিভোগের পারস্পরিক সম্পর্কে একটা সুদৃঢ় দ্বন্দ্বিক চরিত্র থাকে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদননী শক্তির বৃদ্ধিতে ধরে নেওয়া হয় যেমন মেহনতিদের চাহিদার সম্প্রসারণ, তেমনি তা পূরণের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বৃদ্ধি। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর্বে এটা হল সামাজিক প্রগতির অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা শর্ত।

সমাজের উৎপাদননী শক্তির বিকাশ আর শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হল একটা সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়ম। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে যেখানে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হল মেহনতিদের সচ্ছলতা বৃদ্ধির উৎস, পুঁজিতন্ত্রে সেখানে তার অর্থ মেহনতি জনগণের শোষণ আর পুঁজিপতিদের মুনাকাফা বৃদ্ধি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি মেহনতির জানা থাকে যে খাটছে সে নিজের জন্য, নিজ রাষ্ট্রের জন্য, গোটা সমাজের স্বার্থে, সেটা হল শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পক্ষে একটা প্রবল প্রেরণা। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে এই কর্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে: বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি স্বরণের ভিত্তিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট বাড়তে হবে। সামনের ১৫ বছরে তা ২.৩-২.৫ গুণ বাড়বার কথা আছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সহযোগিতা আর কমরেডসুলভ পারস্পরিক সাহায্যের যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান নেই। তার বদলে চলে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার প্রকাশ পায় নতুন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক। তা হল ব্যাপক জনগণের সচেতন শ্রম সক্রিয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা বৃদ্ধি, শ্রমের অগ্রণী রূপ ও পদ্ধতি আয়ত্তির উদ্দেশ্যে চালিত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রণালী। সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা হল মেহনতিদের লালিত করে তোলার উপায়। তাদের কর্মদক্ষতা, সামাজিক চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য হয় তাতে, লোকে শেখে সামাজিক স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উৎপাদনের ফলপ্রদতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির সুকৃতিগুণের সদ্ব্যবহার, উৎপাদনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ বর্ধন মারফত। আর পুর্জিতন্ত্রে যেখানে প্রভু শ্রেণী বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতিকে কাজে লাগায় নিজেদের সামাজিক মহড়া-সামর্থ্য প্রসারের জন্য, অর্থনীতির সামরীকরণ, অস্র প্রতিযোগিতা বাড়াবার জন্য, অর্থাৎ যাতে সাহায্য হয় শ্রেণী বৈর বজায় রাখা ও বাড়াতে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেখানে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির আঙ্গিক যোগাযোগ ঘটিয়ে মেহনতিদের চাহিদা পূরণে সাহায্য করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ পরিকল্পিত। অর্থনীতির পরিকল্পন হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কাজ। পরিকল্পিত পরিচালনা চলে অর্থনীতির অবজেকটিভ নিয়মের যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনের নীতিগত দল নিবদ্ধ হয়েছে লেনিনের রচনায়, সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির দলিলপত্রে।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনে সঠিকভাবে মেলানো হয় কেন্দ্রীকৃত পরিচালনার সঙ্গে স্থানীয় সংস্থাগুলির ব্যাপক উদ্যোগ। কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পিত পরিচালনার সর্বপ্রথম কাজ হল জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের মূল ধারাগুলি সুনির্দিষ্ট করা। কেন্দ্রীকৃত পরিচালনার ভূমিকা ছোটো করে দেখলে পরিণামে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বই নষ্ট হয়। স্থানীয় সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক উদ্যোগশীলতায় পরিকল্পনে, টেকনিকাল ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানে প্রসারিত হয় উদ্যোগের অধিকার।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রচনা। তা নীতিগত অবস্থান হল: সাফল্যের সঙ্গে আজকের দিনের জরুরি সমস্যার সমাধান সম্ভব কেবল ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত থাকলে। পরিপ্রেক্ষিতমূলক পরিকল্পনা রচিত ও বাতর্ঘ্য বছরের মেয়াদে। জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের সাধারণ ধারা নির্দিষ্ট হয় ১০-১৫ বছরের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায়। একক রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় সম্ভব হয়

শিল্প, বিজ্ঞান, সংস্কৃতির সমস্ত শাখার সদুপযোগী
বিকাশ, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য অনুযায়ী আর্থিক, বৈষয়িক
ও শ্রমমূলক সম্পদের সদ্যবহার।

পরিকল্পন হল গোটা সমাজ জুড়ে তেমন লোকেদের
উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের সংগঠন যারা শোষণ থেকে
মুক্ত, কাজ করছে উৎপাদনের সামাজিক উপায়ের
সাহায্যে। এটা হল বর্ধিত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার
সচেতন পরিচালনার পদ্ধতি, যা কেবল সমাজতান্ত্রিক
সমাজেরই চরিত্রগত।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা দেখাবার চেষ্টা করে যে
পুঁজিতন্ত্রেও অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশ সম্ভব।
এর জন্য 'পরিকল্পিত', 'সংগঠিত', 'সংকটহীন',
'নিয়ন্ত্রিত' ইত্যাদি পুঁজিতন্ত্রের বহু ধামাধরা তত্ত্ব
সৃষ্টি হচ্ছে। এ ব্যাপারে তারা ভরসা করে রাষ্ট্রীয়-
একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ওপর, বুর্জোয়া
রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ন্ত্রণ ও পূর্বাভাস
প্রাপ্তির ব্যবস্থার ওপর, তার সাহায্যে নাকি সংকট,
বেকারি, মদ্রাস্থিতি, পুঁজিতন্ত্রের অন্যান্য বিরোধের
আত্মপ্রকাশ দূর করা যাবে। এসব তত্ত্ব রচনার উদ্দেশ্য
হল সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বে আমল না দেওয়া, এইটে
দেখানো যে ভবিষ্যতেও পুঁজিতন্ত্রের সীমাহীন বিকাশ
সম্ভব। তবে ইতিহাসে সমর্থিত হচ্ছে মার্কসবাদী-
লেনিনবাদী এই বক্তব্য যে ব্যক্তিগত-পুঁজিতান্ত্রিক
অর্থনৈতিক বিকাশের ভেত শক্তিকে সামলানো
বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব।

সমাজতন্ত্রে জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের পরিকল্পিত

চরিত্র মেলে আনুপাতিকতার সঙ্গে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজের পরিপক্ব চাহিদা থেকে এগিয়ে এক-একটা শাখার ভবিষ্যৎ বিকাশের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুপাত স্থাপন করে। এই অনুপাতগুলি অপরিবর্তনীয় কিছুর নয়, তা সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের গতিপথে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনীতি হল দেশটির সমগ্র ভূখণ্ডে সামাজিক উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সমস্ত ধাপ নিয়ে একটি একক জাতীয়-অর্থনৈতিক কমপ্লেক্স। এই কমপ্লেক্সের মূল্যগুণগুলি হল: উচ্চবিকাশিত উৎপাদনী শক্তি, অগ্রণী সমাজতান্ত্রিক শিল্প, যৌথ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত উচ্চ যন্ত্রায়িত কৃষি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনে কৃষিতে, কুটির ও কারুশিল্পে, অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সেবাকর্মে ব্যক্তিগত শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপও অনুমোদিত। ব্যক্তিগত শ্রমকর্ম রাষ্ট্র কাজে লাগায় সমাজের স্বার্থে।

নাগরিকদের যেমন যৌথ, তেমনি ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপে, সামাজিক উৎপাদনের সমস্ত ধাপে ভূমি ও ভূগর্ভ, জলসম্পদ, জীবজগৎ, উদ্ভিদ রক্ষা ও বৃদ্ধিযুক্ত সদ্যবহারের জন্য, বাতাস আর জলের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য, প্রাকৃতিক সম্পদের পুনরুৎপাদন নিশ্চিত করা ও মানুষের পরিবেশ উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। সেটা করা হয় কেবল বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থেই নয়। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়

করিয়া পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি সযত্ন থেকে কর্মিউনিষ্টরা ভবিষ্যতের জন্যও ভাবিত।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্রের পক্ষে যথোচিত বৈষয়িক-টেকনিকাল ভিত্তি, অর্থাৎ শ্রমের হাতিয়ার, উৎপাদন শক্তির সেই সমষ্টি যাতে সম্ভব হয় সমাজতন্ত্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্তব্য সাধন, তার আদর্শ ও নীতিগতগুলির বাস্তব রূপায়ণ, সামাজিক বিকাশের গতিকে মেহনতিদের স্বার্থাধীনে নিয়োজন। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক বনিয়াদ — উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন — এটা সমাজতন্ত্র নির্মাণের সুদীর্ঘ পর্ব জুড়ে অপরিবর্তিত থাকে। তবে সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রতিটি ধাপের বৈশিষ্ট্য হল তখনকার মূর্ত-নির্দিষ্ট কর্তব্য।

পূর্জিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্বে পাতা হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি: গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্রের শিল্প বনিয়াদ, কার্যকৃত হয় কৃষির যৌথ ভিত্তিতে উত্তরণ। বিলুপ্ত হয় শোষণের সুযোগ। বন্ধ হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রাম, বাজার-নির্ভর স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্কাদি।

সমাজ নির্মাণে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপগুলিকে পাকাপোক্ত করা হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকশিত হতে থাকে নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ সুসম্পূর্ণ হবার সুদীর্ঘ পর্বের

বৈশিষ্ট্য হল এই যে নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর বিকাশমান সমাজ পদুপাদার কাজে লাগায় তার মধ্যে নিহিত সমস্ত সম্ভাবনা। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়ণের, সর্বোচ্চ পরিমাণে মেহনতিদের সচ্ছলতা বৃদ্ধির নির্ধারক শর্ত হল দুটি বিপ্লব, সামাজিক আর বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের সফলগতালিকে কার্যক্ষেত্রে মেলানো।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক সমাজের বনিয়াদ হওয়ায় তার ক্রিয়াকলাপের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি অন্য সমস্ত ক্ষেত্রের বিকাশকেও নির্ধারিত করে দেয়।

সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিতে অচলাবস্থা আর সংকট, বেকারি আর মৃদ্রাস্ফীতি, উৎপাদনে মন্দা আর বিকৃতির অভিশাপ নেই। মেহনতিদের বৈষয়িক আর আত্মিক চাহিদা তা মেটাচ্ছে ক্রমেই পূর্ণাকারে, সদুসমঞ্জস রূপে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক মানবোতিহাসে এই প্রথম সমগ্র সমাজের চাহিদা আর স্বার্থ এবং প্রতিটি মেহনতির চাহিদা আর স্বার্থের মধ্যে ঐক্য ঘটায়। এই অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিপুল এক পদক্ষেপ করেছে সমাজতন্ত্র।

৩। রাজনৈতিক ব্যবস্থা

যেকোনো সমাজের, সমাজতান্ত্রিক সমাজের তো বিশেষ করেই, অর্থনীতি আর রাজনীতি একটা দ্বন্দ্বিক

সম্পর্কে অন্বিত। এটা দৈবাৎ নয় যে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম রাজনৈতিক কর্ম ক্ষমতাদখল চালিত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণে, যথা : উৎপাদনের উপায়কে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন। রাজনৈতিক ক্ষমতা পদুরোপদুরি হাতে থাকলেই কেবল অর্থনৈতিক প্রশ্নের সমাধান করা যায়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হল সমাজতান্ত্রিক সর্বজনীন রাষ্ট্র। তাতে প্রকাশ পায় শ্রমিক, কৃষক আর বুদ্ধিজীবী, সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার অভিপ্রায় আর স্বার্থ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ হল জনগণের স্ফূর্তি রক্ষা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের সংগঠন ও পরিচালনা নিশ্চিত করা।

তবে সর্বজনীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হওয়া মাত্রই নয়, সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর্বে। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্র। এই পর্যায়ে গড়ে উঠতে থাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাটের বনিয়াদ, শ্রমিক শ্রেণী তখন তার ক্ষমতা ব্যবহার করে শোষকদের প্রতিরোধ দমন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের সংহতি, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার আগ্রাসনী ক্রিয়াকলাপ থেকে প্রতিরক্ষার জন্য। কিন্তু প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রধান কাজটা সৃজনধর্মী, গঠনমূলক। রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর কাজে লাগে অর্থনীতি, সংস্কৃতি, দিনযাপন — জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের জন্য, সমাজতান্ত্রিক

নির্মাণে সমস্ত মেহনতিদের টেনে আনার জন্য। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ভিত্তি হল শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান ভূমিকাধীনে তাদের সঙ্গে মেহনতি কৃষকদের জোট।

বুর্জোয়া শ্রেণী আর পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানাদি বিদূরনের পর, উৎক্রমণ পর্বের প্রধান কর্তব্যগুলি সাধিত হবার পর অভ্যন্তরীণ রাজনীতির দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, ক্রমশ তা ঝরে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের গতিপথে দানা বাঁধে সমাজের সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় ঐক্য। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্র পরিণত হয় সর্বজনীন রাষ্ট্রে।

সর্বজনীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল বিকাশের পরবর্তী দৃষ্টি পর্যায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন এবং তার সম্পূর্ণীকরণের পর্যায়ে সামাজিক পুনর্গঠনের প্রধান হাতিয়ার। সমাজতন্ত্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা চালু করায় ক্রমেই বেশির ভাগ মেহনতি অংশ নিতে থাকে, কেননা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মেহনতিরাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জনগণ রাষ্ট্র ক্ষমতা চালায় জন প্রতিনিধিদের পরিষদ বা সোভিয়েত মারফত। ক্ষমতার রাজনৈতিক ভিত্তি এই সোভিয়েতগুলি হল জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিস্বমূলক গণ সংগঠন। সোভিয়েত ইউনিয়নে তা একমাত্র পূর্ণাধিকারী ক্ষমতার সংস্থা। অন্য সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা জন প্রতিনিধিদের সোভিয়েত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তাদের কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত থেকে শুরুর করে স্থানীয় সোভিয়েত পর্যন্ত তারা গঠন করে রাষ্ট্র চালনার সংস্থা — সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ থেকে জেলার কার্যনির্বাহী কমিটি পর্যন্ত।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংগঠন ও দ্বিয়াকলাপ চলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসারে। এ নীতির অর্থ নিচু থেকে ওপর পর্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠিত হবে নির্বাচনের ভিত্তিতে, তারা জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে, উর্ধ্বতন সংস্থার সিদ্ধান্ত নিম্নতনের পক্ষে বাধ্যতামূলক। এ নীতিতে মিলিত হয়েছে কেন্দ্রিকতা — একক পরিচালনার সঙ্গে গণতন্ত্র — জনগণের উদ্যোগশীলতা ও সৃজনী সক্রিয়তা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে নির্বাচনী অভিযান সমাজতান্ত্রিক জনক্ষমতার অন্তর্নিহিত সুবিধা রূপায়ণের ফলপ্রসূতার সাক্ষ্য, তা হল জন অভিপ্রায়ের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। নির্বাচনের আয়োজন ও সম্পাদন চলে ব্যাপক কার্যকরী ভিত্তিতে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানের দাবি পুরোপুরি মেনে, নির্বাচনী কমিশনগুলিতে কর্মরত মেহনতিদের ব্যাপক অংশগ্রহণে।

নির্বাচকদের প্রাক্নির্বাচনী সভা ও সাক্ষাৎকারগুলিতে প্রার্থীদের রাজনৈতিক ও কর্মগুণ নিয়ে অবাধ ও সর্বাঙ্গীণ আলোচনা চলে, তাদের নির্দেশনামা দেওয়া হয়, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলির কাজকর্ম আরো উন্নত করা যায় কিভাবে সে সম্পর্কে প্রস্তাবাদি ও ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। কেননা

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনী অভিযান সর্বদাই হল নির্দিষ্ট সময়টিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের সারসংকলন, সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে কী কী করা হল তার বিশ্লেষণ।

সোভিয়েতের জন প্রতিনিধিরা হলেন জনগণের সেরা প্রতিভা, রাষ্ট্র চালনায় জনগণের আস্থাভাজন। এঁরা হলেন সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার লোক, কমিউনিস্ট আর পার্টিবহির্ভূত; শ্রমিক, কৃষির মেহনতি, বুদ্ধিজীবী; নারী আর পুরুষ; ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী যুবজন। একটা নির্বাচন থেকে অন্য নির্বাচনে ৫০ শতাংশ প্রতিনিধি হয় নবনির্বাচিত।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রশ্রমতার সংস্থায় নির্বাচন চলে সর্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে, গোপন ব্যালটে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে তা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত সিদ্ধান্ত নেয় রাষ্ট্রজীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিতে। সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নগুলি থাকে সর্বজনীন আলোচনার আওতায়। কিন্তু সে আলোচনার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেবার পর তা প্রত্যেকের পক্ষে অবশ্যপালনীয়, কেননা তা গৃহীত হয়েছে অধিকাংশ কর্তৃক অধিকাংশের স্বার্থে। রাষ্ট্রজীবনের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা হয় গণভোট, রেফারেন্ডাম মারফত।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং প্রত্যেক পদাধিকারী ব্যক্তির তাদের ওপর অর্পিত কর্মভারের জন্য দায়ী। এটাও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নীতির একটা জাজদল্যমান প্রকাশ।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, তার সমস্ত সংস্থা কাজ চালায় সমাজতান্ত্রিক আইনানুগতের ভিত্তিতে। তাতে নিশ্চিত হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সমাজের স্বার্থ, মেহনতিদের অধিকার ও স্বাধীনতা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সংগঠন, পদাধিকারী ব্যক্তির সংবিধান ও আইন অনুসরণে বাধ্য। এই দাবিতে নিহিত সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিপুল মানবিকতা, কেননা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান আর আইন মেহনতিদের স্বার্থ রক্ষা করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল জনশ্রমতার একটা যন্ত্রব্যবস্থা, তা গড়ে ওঠে ব্যবহারশাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধির ভিত্তিতে সক্রিয় যেমন রাষ্ট্রিক, তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির পুরো একটা কমপ্লেক্স দিয়ে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় খোদ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি ছাড়াও সামাজিক গণ সংগঠনগুলিও অন্তর্ভুক্ত, সেগুলি তাদের নিয়মাবলির অন্তর্গত কর্তব্য অনুসারে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারাদির পরিচালনায়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রশ্নাদিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়। নিজেদের সাধারণ গঠনের দিক থেকে সমাজের প্রায় সমস্ত সাবালক অধিবাসীদের নিয়ে

এগুঁলি গড়া। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক সংগঠন হল সমাজের ব্যাপারাদি চালনায় মেহনতিদের অংশগ্রহণের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন ধরনের সংগঠনে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হবার অধিকার সংবিধানে বিধিবদ্ধ ও রাষ্ট্র দ্বারা গ্যারান্টিকৃত।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জীবনে সক্রিয় অংশ নেয় যেসব সামাজিক সংগঠন, তার মধ্যে সর্বাপ্রাে পড়ে ট্রেড ইউনিয়ন। ট্রেড ইউনিয়ন হল সবচেয়ে গণচরিত্রের সামাজিক সংগঠন, পরিচালনার বিদ্যালয়, ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদনী শক্তির বিকাশে, শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিতে, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির স্বরণে তা একটা বৃহৎ সাংগঠনিক শক্তি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আইন-প্রণয়নী উদ্যোগ নেবার অধিকার আছে ট্রেড ইউনিয়নগুলির, রাষ্ট্রীয় সামাজিক বীমার ব্যবস্থাটা তারা চালায়, রাষ্ট্রীয় সংস্থাদির সঙ্গে একত্রে শ্রম ও পরিভোগের মানের ওপর, শ্রম আইন পালনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে।

ট্রেড ইউনিয়নের একটা প্রধান কর্তব্য হল সমস্ত মেহনতির আইন-সম্প্রত স্বার্থ নিয়ে, তাদের শ্রম ও জীবনযাত্রার উন্নয়ন নিয়ে প্রযত্ন, শ্রম আইন পালনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, শ্রম রক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়মকানুন পালনের ওপর তদারকি, মেহনতিদের অবকাশ যাপনের সুব্যবস্থার জন্য প্রয়াস। উৎপাদন পরিচালনায় সরাসরি অংশ নেয় ট্রেড ইউনিয়ন। কর্মীদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রম ও বেতনের সমস্ত

প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় সংস্থা সিদ্ধান্ত নেয় কেবল ট্রেড-ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্রে। যেমন তা সোভিয়েত ইউনিয়নে উদ্যোগাদির প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্মের বেশির ভাগই ট্রেড-ইউনিয়ন কমিটির সম্মতি বিনা চালু হতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়নের সম্মতি ছাড়া বরখাস্ত হতে পারে না কোনো একজন কর্মীও। ট্রেড ইউনিয়নের অংশগ্রহণ ব্যতীত চালু হতে পারে না কোনো উদ্যোগ, সে উদ্যোগে শ্রম রক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর তদারকি করে তারা।

ট্রেড ইউনিয়নের আরো শক্তিবৃদ্ধি, সমাজতান্ত্রিক সমাজের জীবনে তাদের ভূমিকা বর্ধন হল সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশ নেয় এমন স্বেচ্ছামূলক সামাজিক সংগঠনগুলির মধ্যে আরো পড়ে: যুব সংগঠন, ব্যাপক সমবায়মূলক সম্মিলন, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, টেকনিকাল, ক্রীড়ামূলক সংগঠন, সাহিত্যিক, সুরকার, সাংবাদিক, শিল্পী, নারী প্রভৃতির সমিতি যা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজের শক্তি তার ঐক্যে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুদৃঢ় ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক ঐক্য নিশ্চিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি'কে ঘিরে মেহনতিদের সংহতিতে, এই পার্টি হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের নেতা এবং চালিকা শক্তি। নেতৃত্বের অবস্থান কমিউনিস্ট পার্টি অর্জন করেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ, মেহনতিদের স্বার্থের জন্য তার আত্মোৎসর্গী সংগ্রামের দৌলতে।

বহিঃপরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধি, আগ্রাসনের ক্ষমতা
খর্ব করা ও পারমাণবিক বিপদ থেকে মানবজাতিকে
বাঁচাবার জন্য ঐকান্তিক প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার
কারণেও পার্টির ভূমিকাবৃদ্ধি আবশ্যিক হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি মেহনতি জনগণের বিশ্বস্ত সেবক,
তাদের যে সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বীকৃত
অগ্রবাহিনী শক্তি। তার শক্তি এইখানে যে মার্ক্সবাদ-
লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে সশস্ত্র হওয়ার তা
বিকাশের অবজেকটিভ সামাজিক প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে
বুঝতে পারে এবং সেইহেতু অনুসরণ করে বাস্তবধর্মী
পলিসি। সামাজিক-অর্থনৈতিক পলিসির মূল ধারা
নির্ণয়, তা অনুসরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ, চালক কর্মীদের
বাছাই ও নিয়োগ মারফত সমাজতান্ত্রিক সমাজের
পরিচালক ভূমিকা পালন করে কমিউনিস্ট পার্টি।
সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সর্ব স্তরে অর্থনীতিতে পার্টি
পরিচালনার সূত্র হল — কাজটা অর্থনৈতিক, পদ্ধতি
রাজনৈতিক।

পার্টি জীবনের বিধি হল আলোচনা ও সমালোচনার
স্বাধীনতা, কেননা তাতেই জরুরি সমস্যাটির সার্থক
বিবেচনায় সাহায্য হয়: সঠিক সিদ্ধান্ত সম্ভব কেবল
প্রশ্নটির যৌথ আলোচনার মাধ্যমেই।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের প্রক্রিয়ায় কমিউনিস্ট
পার্টির গঠনেও পরিবর্তন ঘটে: শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি
হয়ে ওঠে মেহনতিদের পার্টি, কেননা তার ক্রিয়াকলাপের
প্রধান নিরিখ হল সমস্ত মেহনতির স্বার্থ সাধন।
কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হল সমস্ত জাতিসত্তার লোক।

পার্টির জাতীয় বিন্যাস প্রসারের ফলে দৃঢ় হয় তার আন্তর্জাতিক সংহতি।

কমিউনিস্ট পার্টি হল সৃজনমূলক যৌথ বিচারবুদ্ধি, তাতে মেলে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টির স্থিতধী রাজনৈতিক দৃষ্টি নিবন্ধ প্রতিটি বড়ো বড়ো ঐতিহাসিক পর্বের জন্য সমাজতন্ত্র নির্মাণের রণনীতি ও রণকৌশল রচনায়। সমাজতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পার্টির ভূমিকাও বাড়ে। তার কারণ সমাজ পদনগঠনের যে কাজ, তার পরিসর ও জটিলতা বৃদ্ধি, জনগণের সৃজনমূলক সক্রিয়তায় জোয়ার, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আরো বিকাশ।

সমাজতন্ত্র তার শ্রেষ্ঠত্ব রূপায়িত করে গণতন্ত্রের মাধ্যমে, কেননা সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাই গণতান্ত্রিক বলে স্বীকৃত যা মেহনতিদের স্বার্থসাধক। লোকেদের মধ্যে সমতার মহতী ভাবনাকে সমাজতন্ত্রই প্রথম বাস্তব বিষয়বস্তু দিয়ে সারগর্ভ করেছে। এটাই হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিশেষত্ব। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই তার ধর্ম।

সত্যকার গণতন্ত্র যেমন সমাজতন্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়, তেমনি সমাজতন্ত্রও গণতন্ত্রের অবিরাম বিকাশ ছাড়া অসম্ভব। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের একটা মূলকথাই হল — ইতিহাসের সত্যকার স্রষ্টা জনসাধারণ। সেই জন্যই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সরকারেরা মেহনতিদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে

তৎপরতা সঞ্চারকেই তাদের প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য করে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রধান সারার্থ হল — রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি থেকে তাদের অপসারণ নয়, বরং রাজনৈতিক জীবনে, রাষ্ট্রের পরিচালনায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হল মেহনতিদের সত্যকার স্বাধীনতা ও নাগরিক দায়িত্বের ঐক্য, ব্যক্তি আর সমাজের, যৌথের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রত্যেককে দেয় অধিকার এবং নিজেদের রাষ্ট্রের মালিক বলে নিজেকে হাজির করার দায়িত্ব।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের নিচুতলার ধাপ হল শ্রমযৌথ। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে, উৎপাদন ও সামাজিক বিকাশের পরিকল্পনে, কর্মচালকদের তৈরি ও নিয়োগ করায় অংশ নেয় শ্রমযৌথ। উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, শ্রম ও জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নয়নের প্রশ্ন নিয়ে, উৎপাদন বিকাশের জন্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও বৈষয়িক উৎসাহদানের জন্য উপায়াদি ব্যবহার নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা নেয় তারা। শ্রমযৌথের অধিকার ও দায়িত্ব সোভিয়েত রাষ্ট্রে আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ।

তবে একথা ভোলা অনুচিত যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সচেতন শৃঙ্খলার ওপর। কার্যক্ষেত্রে মেহনতি জনগণের স্বার্থ সাধনের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল শৃঙ্খলা। সেটাই গণতন্ত্র রূপায়ণের পূর্বশর্ত। সচেতন নিয়মানুবর্তিতা আর পাকাপোক্ত সামাজিক শৃঙ্খলা

ছাড়া গণতন্ত্র হয়ে থাকে একটা শ্রুতিমধুর ফাঁকা বুলি। শ্রমশৃঙ্খলা বর্ধনে সাহায্য করে শ্রমযৌথ, সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতায় লালিত করে তার সদস্যদের, তাদের রাজনৈতিক চেতনা, সংস্কৃতি, পেশাদারি গুণ বাড়িয়ে তোলার জন্য চেষ্টিত থাকে।

সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের প্রধান ধারা হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আরো বিকাশ। তার কাজ হল রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যাপারাদি চালনায় মেহনতিদের ক্রমাগত ব্যাপকতর অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রযন্ত্রের উন্নয়ন, সামাজিক সংগঠনাদির সক্রিয়তা বৃদ্ধি। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সম্পূর্ণীকরণের সঙ্গে সঙ্গে চলবে মেহনতিদের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ বর্ধন, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের আইনি ভিত্তির সংহতি, প্রকাশ্যতার প্রসার, অবিরাম জনমত গ্রহণ।

সমাজতন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হল মেহনতিদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের ভূমিকা বৃদ্ধির সাধারণ সমাজবিদ্যাগত নিয়মটি সক্রিয় হবার পূর্ণ পরিসর পায় সমাজতন্ত্রেই প্রথম। তাই সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি'রা তাদের ক্রিয়াকর্মের রণনীতি ও রণকৌশল এমনভাবে নির্ধারণ করে যাতে সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকাশ পায় সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের স্বার্থ, আরো প্রসারিত হয় জনগণের আত্মোদ্যোগ ও তৎপরতার সুযোগ, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যাপারাদি চালনায় প্রত্যেকের

সরাসরি অংশগ্রহণ সন্নিশ্চিত করার সমুচ্চ লক্ষ্যে সে ব্যবস্থা যেন কাজ করে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বহুত্ববাদের বিপরীতে বাস্তব সমাজতন্ত্র তুলে ধরে নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামাজিক শক্তির বৈচিত্র্য। কেননা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অবিচল বিকাশই হল কমিউনিস্ট সামাজিক স্বশাসনের পথ।

৪। সামাজিক বিকাশ

সামাজিক-শ্রেণীগত ও জাতীয় কাঠামোয় প্রতিফলিত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরীণ গড়ন। শাসক শ্রেণীরা যুগ যুগ ধরে যে জনগণকে পীড়ন করে এসেছে, ইতিহাসের মঞ্চে তাদের প্রবেশ, তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি সম্ভব হয় বিশ্বে প্রগাঢ় সামাজিক পরিবর্তনের কল্যাণে। ঠিক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই ঘটেছে মেহনতিদের অবস্থা ও ভূমিকায় আমূল পরিবর্তন, তারা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজেদের জীবনের কর্তা ও স্রষ্টা।

উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে সমাজতন্ত্র লোকেদের মধ্যে বৈরী সম্পর্কের অবসান ঘটায়। তার জায়গায় আসে সহযোগিতা, পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্ক। সেটা বোঝাই যায়: সমাজতান্ত্রিক সমাজের কর্তা হল স্বয়ং মেহনতিরাই! তবে তার মধ্যে শ্রেণী ও সামাজিক স্তর তখনো থেকেই যায়, ঐতিহাসিক বিবর্তনই তার কারণ।

সামাজিক গঠন হল সমাজে ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট শ্রমবিভাগের নিয়মসঙ্গত প্রতিফলন, সেটা প্রকাশ পায় উৎপাদন ও সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকেদের অন্তর্ভুক্তি এবং এইসব গ্রুপের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। সামাজিক গঠনের ভিত্তিতে থাকে সমাজের প্রধান উৎপাদনী সম্পর্ক। উৎপাদনের প্রণালীর পরিবর্তনের ফলে সামাজিক গঠনও পরিবর্তিত হয়। সামাজিক গঠনও আবার যেমন উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্ক, তেমনি সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন ও আর্থিক জীবনকেও সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে।

লোকেদের বড়ো বড়ো যে সমষ্টিতে শ্রেণী বলা হয় তারা চিহ্নিত হয়: সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের স্থান; উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক; শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা; সামাজিক সম্পদের অংশ পাবার পদ্ধতি এবং সে অংশের পরিমাণ দিয়ে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শোষণ এবং লোকেদের এমন ভাগাভাগি নেই যাতে একদল অন্যদলের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের সামাজিক বিন্যাস হল শ্রমিক শ্রেণী, যৌথখামারি কৃষক আর বুদ্ধিজীবীদের জোট।

শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যের কারণ হল দুই ধরনের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা; একদিকে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক, অন্যদিকে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পার্থক্যের কারণ দৈহিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য। শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশই অর্থনীতির

নির্ধারক অংশ, শিল্পে নিয়োজিত, তাই তারা হল সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রধান শক্তি। শ্রমিকদের কাজ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল নিয়ে, যা রাষ্ট্রীয়তনে সামাজীকৃত। সমবায়ী কৃষকেরা শ্রমের যে হাতিয়ার ব্যবহার করে, তা সামাজীকৃত নির্দিষ্ট শ্রমযৌথটির আয়তনে। তাদের শ্রম সামবায়িক মালিকানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

আর শ্রমের সামাজিক সংগঠনের কথা যদি ধরি, তাহলে পূর্নজিতনে যেখানে একদল শ্রমের ব্যবস্থাপনা চালায়, অন্যদল সেটা পালন করে যায়, সমাজতন্ত্রে সেক্ষেত্রে শ্রম এবং গোটা শ্রম প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ উৎপাদক-মালিকদের হাতে মিলিত।

এবং পরিশেষে বণ্টনে পার্থক্য। শ্রমিক আর সমবায়ী কৃষক বণ্টনের বিভিন্ন ধরনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শ্রমিকদের আয়ের রূপটা হল পারিশ্রমিক। সমবায়ী কৃষক তার শ্রমের জন্য যৌথ অর্থনীতি থেকে পাওয়া পারিশ্রমিক ছাড়াও (সেটা নির্ভর করে নির্দিষ্ট খামারটির আয়ের ওপর) ব্যক্তিগত সহায়ক জোতের অধিকারী, তার উৎপাদ সংসারের প্রয়োজন মেটায়। একই সময়ে শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতির ক্রিয়ায়, শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সামাজীকরণের প্রক্রিয়ায় সামাজিক সম্পদ থেকে শ্রমিক শ্রেণী ও সমবায়ী কৃষকদের প্রাপ্য অংশ সমান হয়ে আসে, সামাজিক সম্পদে শ্রমলব্ধ ভাগ পাওয়ার পদ্ধতি হয়ে ওঠে সমরূপ।

বিশেষ একটা সামাজিক গ্রুপ হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের

অস্তিত্ব মানসিক ও কার্যিক শ্রমের পার্থক্যের সঙ্গে জড়িত। বুদ্ধিজীবী হল তেমন লোক যাদের পেশা উঁচু মানের মানসিক শ্রম, তার জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে গড়ে ওঠে শ্রমনির্ভর বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবী সমাজের বুদ্ধিজীবী থেকে যা নীতিগতভাবে পৃথক। সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত, তাদের প্রয়োজনের জন্য খাটে। বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ শ্রমিক ও কৃষকদের, সমস্ত মেহনতিদের স্বার্থ থেকে আবিচ্ছেদ্য।

সমাজতন্ত্র কেন অবিলম্বেই সামাজিক সমতার যুগ-যুগের সমস্যাটার সমাধান করে ফেলতে পারে না, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে মেহনতিদের সবাইয়ের সমান সম্পর্ক স্থাপন, শ্রম ও বণ্টনের সমান পরিস্থিতি প্রবর্তন, সামাজিক ব্যাপারাদির চালনায় সমস্ত নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে না? এ সমস্যার সমাধান হতে পারে কেবল কড়াকড়ি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে, শ্রেণীগুলির, ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও গুণাবলির যান্ত্রিক সমতাসাধনের নীতি দিয়ে নয়। এ সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানে সর্বাগ্রে বিবেচ্য পুঁজিতন্ত্র থেকে পাওয়া পুরনো দায়ভাগগুলি, শ্রম বিভাগ ও তার ফলাফল কাটিয়ে ওঠার প্রশ্ন, যথা: মানসিক ও কার্যিক শ্রম, সৃজনধর্মী ও যান্ত্রিক, অনুৎপাদক ব্যবস্থাপক ও নির্বাহক শ্রমের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজে এ সমস্যার সমাধান হবে ক্রমে ক্রমে, কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক সঠিক সামাজিক পলিসি

অনুসরণের ফলে। অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তন ঘটলে তো আপনা থেকেই শ্রেণীর জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, চেতনা নতুন হয়ে ওঠে না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক পলিসি নির্ধারিত হয় সমাজতন্ত্র গঠনের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কর্তব্যগুলি থেকে।

যেমন, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্বে সামাজিক পলিসির প্রধান যে ধারা — মেহনতিদের প্রতি বৈরভাবাপন্ন শ্রেণীগুলির উচ্ছেদ, এই ধারাটার রূপায়ণ জড়িত এ পর্বের মূলগত অর্থনৈতিক কর্তব্য সাধনের সঙ্গে: উৎপাদনী উপায়ের সামাজীকরণ, অর্থনীতিতে বহুরূপী ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনে, সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও সমাজতান্ত্রিক কৃষি গঠনে উত্তরণ। সমাজতন্ত্রের ভিত্তি গঠনের পর্যায়ে দূর করা হয় সর্বাধিক তীক্ষ্ণ সেইসব সামাজিক-শ্রেণীগত পার্থক্য যা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের লক্ষ্য সাধনে প্রতিবন্ধক। এই সময় সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক কাঠামোয় এমনসব মূলগত পরিবর্তন ঘটানো হয় যাতে পুঁজিতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়ে পড়ে অসম্ভব। সেটা হল শ্রেণীগত-সামাজিক বৈরিতার বিলুপ্তি (বুর্জোয়া আর উৎপাদনের উপায়ের মালিক, শোষক শ্রেণী হিশেবে বিদ্যমান থাকে না, হারায় সে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশেষ সুবিধা) এবং ক্ষুদ্রে উৎপাদকদের অত্যাধিকাংশের সামাজিক চরিত্র পরিবর্তনের পথ গ্রহণ (মেহনতি

অধিবাসীদের জনপুঞ্জ তাদের ক্রমশ মিলিয়ে যেতে হবে)।

উৎক্রমণ পর্বে সামাজিক রূপান্তরের কেন্দ্রে থাকে যে সামাজিক শক্তি, সে হল শ্রমিক শ্রেণী, সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সে থাকে পরিচালক পদে। তার হাতে থাকে সমাজতান্ত্রিক শিল্প বা উৎপাদনী শক্তির বিকাশ, এবং সুতরাং সমগ্র সমাজের সচ্ছলতা বৃদ্ধির ভিত্তি। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতি কৃষক একটা গুরুগত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়: ব্যক্তিগত শ্রম থেকে সমবায়ী শ্রমে, ক্ষুদ্রমালিকি মনোবৃত্তি থেকে যৌথ মানসিকতায়। বুদ্ধিজীবীদের অবস্থাতেও আমূল পরিবর্তন ঘটে। বুর্জোয়ার সেবাদাস থেকে তারা পরিণত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমাধিকারী সদস্য, খোলাখুলি রক্ষা করে শ্রমিক শ্রেণী আর মেহনতি কৃষকদের স্বার্থ, শ্রমগ্রুপ হিসেবে তাদের নিজেদের স্বার্থের সঙ্গেই সে স্বার্থ মিলে যায়।

তবে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে শোষক শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপগুলি অন্তর্ধান করলেও বেশ দীর্ঘকাল ধরে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার পক্ষে অনুপ্রবেশ, নবীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেণী বিন্যাসে প্রভাবপাতের খানিকটা সুযোগ থেকে যায়। তার কারণ নাগরিকদের বড়ো একটা অংশে, সর্বাত্মে বিত্তবান বংশাগতদের মধ্যে ক্ষুদ্রমালিকি দৃষ্টিভঙ্গির জের রয়ে যাওয়া। কিন্তু সেই সঙ্গেই সমাজতন্ত্রবিরোধী গ্রুপগুলির উদ্ভব ও ত্রিয়াকলাপের অভ্যন্তরীণ অবজেকটিভ পরিস্থিতি লোপ পেতে থাকে। সেই

कारणे उङ्क्रमण पर्वे एवं समाजतान्त्रिक समाज सम्पूर्ण हवार पर्वे शासक कमिडनिस्ट पार्टीर सठिक सामाजिक पालिसि अति गदुरद्वपदुर्ग।

समाजतन्त्र निर्माणेर पर्याये समाजे थाके केवल प्रकृतिगतभावे समाजतान्त्रिक चरित्रेर मेहनति श्रेणी ओ सामाजिक ग्रुपेरा। समाजतन्त्रेर श्रेष्ठत्वेर ओपर प्रतिष्ठित एवं वैज्ञानिक-टेकनिकाल विप्रवेर फलस्वरुप कृषि-शिल्पेर ये अङ्गीभूति वेडे उठछे, तार परिणामे बेश मूछे याछे मेहनति श्रेणीगदुलिर मध्ये सीमारेखा, सामाजिक भेदरेखागदुलि हये उठछे अस्थिर, एकटा सामाजिक स्तर थेके अन्याटाय अबाध स्थानान्तर घटछे मेहनतिदेर।

समाजतान्त्रिक समाजेर जातीय अर्थनीतिते प्राधान्य लाब करे निजेदेर संविन्यास ओ सामाजिक भित्तिर दिक थेके नतून श्रमिक श्रेणी। तार वैशिष्ट्य हल शिक्षा ओ नैपदुण्येर उच्च मान। श्रमिक श्रेणीर सामाजिक सक्रियताओ वेडे उठछे, केनना बृद्धि पाछे सद्निपदुण मानसिक श्रमेर भाग।

समाजतान्त्रिक समाज निर्माणे श्रमिक श्रेणीर सहयोगे गदुरद्वपदुर्ग भूमिका पालन करे समवायी कृषकदेर श्रेणी। सद्बृहत् योथ जेतेर अर्थनैतिक बनियादे चले आसाय तादेर चरित्रेओ घटेछे गदुणगत परिवर्तन, हये दाँडियेछे तारा समाजतान्त्रिक समाजेर अङ्गाङ्गि अंश। समाजतन्त्र गठनेर এই पर्याये कृषि श्रमेर चरित्र ओ संगठने प्रगतिशील परिवर्तन लक्षित हय। वेडे उठछे तार यन्त्रायण ओ स्वयङ्क्रियकरण। कृषि श्रमे

ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হচ্ছে যন্ত্রশিল্পের পদ্ধতি ও টেকনোলজি। মেহনতি কৃষকদের গুণগত সংবিন্যাসেও বদল ঘটছে, কেননা কমিউনিস্ট পার্টির সামাজিক পলিসি তো শহর ও গ্রামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দূর করার উদ্দেশ্যেই চালিত।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের এই পর্বের রূপ নিতে থাকে জনগণের বুদ্ধিজীবী: বেড়ে ওঠে ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, কৃষি-বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংখ্যা। সমাজতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক পলিসি চালিত হয় শ্রমিক শ্রেণী, সমবায়ী কৃষক আর জনগণের বুদ্ধিজীবীদের জোট পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পরবর্তী পর্যায় হল সব দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণ করার পর্ব। এই পর্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক-শ্রেণীগত কাঠামো আরো বিকশিত হয়: সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সহায়তা করে তার সমরূপিতা বাড়িয়ে তোলার জন্য। শ্রেণীগত পার্থক্য, শহর আর গ্রাম, মানসিক আর কার্যিক শ্রমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের বিলুপ্তি চলতেই থাকে। সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ করার পর্যায়ে রূপ নিতে থাকে প্রধানত ও মূলত সমাজের শ্রেণীহীন কাঠামো, যখন ত্র্যমগত মূদ্রে যায় শ্রমিক, কৃষক আর বুদ্ধিজীবীর মধ্যে প্রভেদ, গড়ে উঠতে থাকে ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীহীন শ্রমসমিতি, যার বৈশিষ্ট্য হল একই

অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক আর ভাবাদর্শীয় স্বার্থ।

সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার অবাধ, সর্বাঙ্গীণ ও সদুসমঞ্জস বিকাশকে তার সামাজিক পলিসির কেন্দ্রে স্থান দেয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সমস্ত জাতির জন্য রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির দিক থেকে কার্যক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করে সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রক্রিয়ায় রূপায়িত হয় লেনিন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিদের দ্বারা রচিত জাতীয় সমস্যা সমাধানের কর্মসূচি, যাতে সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার সমাজতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

অতীতের পশ্চাৎপদ জাতিদের জাগিয়ে তোলে এবং স্বাধীন ঐতিহাসিক সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ নির্মাণ, তাদের কতকগুলিকে বাঁচিয়েছে দৈহিক বিলুপ্তি থেকে। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের গতিপথে তারা পেয়েছে নিজস্ব রাষ্ট্রপাট, নিজেদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা দূর করেছে, অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা ও সংস্কৃতির উচ্চতম সমাজতান্ত্রিক রূপকে আয়ত্ত করেছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পর্বে চলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক জীবনের আন্তর্জাতীকরণ; গড়ে ওঠে আন্তর্জাতীয় শ্রম ষোঁথ, বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্যের আন্তর্জাতীয় বিনিময় চলে।

সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ করার পর্ষায়ে আরো বিকশিত

হয় জাতীয় সম্পর্ক, জাতি ও জাতিসত্তাগুলির আরো নৈকট্যসাধনের পাকা ভিত্তি পাতা হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের ঐক্য ও স্থিতিশীলতার ভিত্তি হল সামাজিক ন্যায়পরতার নীতি। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপূর্ণ রূপায়ণের দিকে অগ্রগতি হিশেবে দেখে কমিউনিস্ট পার্টি চেষ্টা করে যাতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক সম্পর্কাদি সমাজতন্ত্রের প্রকৃতিগত এই নীতিটির সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক পলিসির কর্মসূচিগত বক্তব্য হল — সর্বকিছু মানুষের জন্য, সর্বকিছু মানুষের কল্যাণে। ‘প্রত্যেকের অবাধ বিকাশ হল সকলের অবাধ বিকাশের শর্ত’ —এই কমিউনিস্ট আদর্শ অনুসারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মেহনতিদের পক্ষে নিজেদের সৃজনী শক্তি, সামর্থ্য আর গুণ প্রয়োগের বাস্তব সুযোগ প্রসারিত করাকে নিজেদের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকের অবস্থা উন্নয়নের ভিত্তি হওয়া উচিত সামাজিক স্বার্থে তার ক্রমবর্ধমান অবদান, কেননা সমাজতন্ত্র হল নীতিগতভাবে একটা নতুন ব্যবস্থা যা দাবি করে সৃজনধর্মী শ্রম, সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিটি সদস্যের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদায় শ্রমের পরিণতি।

শ্রমের পরিস্থিতি উন্নয়ন ও রক্ষণ, তার বৈজ্ঞানিক সংগঠনের জন্য, জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখায় বহুমুখী যন্ত্রায়ণ আর স্বয়ংক্রিয়তার ভিত্তিতে গুরুত্বভার

কার্যিক শ্রমের হ্রাস এবং পরে তার সম্পূর্ণ বিলোপের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সযত্ন।

উৎপাদনী ক্রিয়াকর্মে কার্যিক ও মানসিক শ্রমের আঙ্গিক মিলনের ফলে সমাজের সমস্ত সদস্য হবে সমরূপী কর্মী, সম্ভব হবে ক্রিয়াকর্মের ধরন বদল। এই ধরনের সৃজনী শ্রমের মধ্যেই যে আকর্ষণ থাকে তাতে সুসামঞ্জস্যে বিকশিত প্রতিটি মেহনতির কাছে তা পরিণত হয় তৃপ্তির উৎসে।

কৃষি শ্রমকে শিল্প শ্রমের প্রকারভেদে পরিণত করার কর্মসূচি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সঙ্গতির সঙ্গে রূপায়িত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলগুলিতে প্রসারিত হচ্ছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, দোকানদারি, সাধারণ ভোজনব্যবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় সার্ভিস, পৌর অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানাদির জাল। গ্রাম-গঞ্জ পুনর্গঠিত হচ্ছে সুব্যবস্থিত লোকালয় রূপে। কৃষিতে শিল্প ধরনের শ্রমের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিকে মদুছে যাচ্ছে মেহনতি শ্রেণীগুলির মাঝখানে সামাজিক সীমারেখা, অন্যদিকে শ্রম হয়ে উঠছে মননধর্মী, তাতে বুদ্ধিজীবীদের আরো কাছে আসছে শ্রমিক ও কৃষকেরা, মানসিক ও কার্যিক শ্রমের লোকেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লোপ পাচ্ছে। শ্রমিক ও কৃষকদের উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপে মানসিক শ্রমের ভাগ ক্রমশ বেড়ে উঠছে, এ শ্রম হয়ে উঠছে ক্রমেই বেশি সারগর্ভ।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ভিত্তিতে পারিশ্রমিকের, মেহনতিদের আসল আয় বৃদ্ধির ধারা অটলভাবে কার্যে পরিণত করে চলে রাষ্ট্র।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগড়িলিতে বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পদের একাংশের বন্টন প্রত্যক্ষ শ্রমের সঙ্গে নয়, অন্যান্য সামাজিক বিবেচনার সঙ্গে জড়িত, সেটা দেওয়া হয় বিনামূল্যে। এটা হল পরিভোগের সামাজিক তহবিল। সামাজিক সংগঠন ও শ্রমযোথগড়িলির ব্যাপক অংশগ্রহণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই তহবিলের বর্ধন ও তার ন্যায্য বন্টনের ব্যবস্থা করে। বিনামূল্যে মেহনতিদের প্রয়োজন মেটানো হয় সর্বাপ্রাে শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা, অবকাশ যাপনের ক্ষেত্রে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দোকান, সাধারণ ভোজনালয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় সার্বিস আর পৌর অর্থনীতির সরকারি ব্যবস্থাও সক্রিয় ও বর্ধমান। জনসেবার সমস্ত ক্ষেত্রে সমবায় ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগড়িলির ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ দেয় রাষ্ট্র।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কমিউনিস্ট পার্টির সামাজিক কর্মসূচির রূপায়ণে আরো বাসস্থান নির্মাণ, শ্রমের পরিস্থিতি ও মাতা-নারীদের জীবনযাত্রা উন্নয়ন, ক্রেস ও কিন্ডারগার্টেন স্থাপন, পরিবেশ রক্ষণ, সত্য-সত্যই গণচরিত্রের শরীরচর্চা বিকাশের কথা আছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগড়িলিতে সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন টেকনোলজি প্রবর্তন, সাধারণ বিদ্যা ও মেহনতিদের পেশাগত প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

মেহনতিদের নৈতিক ও নান্দনিক লালনের জন্য, তাদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য আর্থিক

মূল্যগ্‌দুলির রক্ষণ, বর্ধন ও ব্যাপক সম্ব্যবহারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সযত্ন। সর্বোপায়ে তা পেশাদারি শিল্প ও লৌকিক শিল্পকর্মের বিকাশে উৎসাহ দেয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনকারী জনগণের সংস্কৃতি তার সারার্থের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক হলেও জাতীয় রূপের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক জীবন নির্ধারিত হয় তার বৈষয়িক উৎপাদন, রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কাদি বিকাশের মাত্রা দিয়ে।

৫। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি

সমাজতন্ত্রে সামাজিক প্রগতির মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায় পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি মেহনতির এবং সমগ্রভাবে সমস্ত মেহনতির বিকাশ। সমাজতন্ত্রে যে নতুন মানুষ দেখা দেয়, এ ঘটনা তর্কাতীত। ব্যক্তির যে সমস্যা তার সমাধান হতে পারে কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে তাতে। মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ বিলুপ্ত করে কেবল সমাজতন্ত্রই, আর কেবল সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতেই শ্রমজীবী মানুষ সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করে, কেননা নিজ সামর্থ্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশের বাস্তব পরিস্থিতি তাতেই নিশ্চিত হয়।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রক্রিয়ার ব্যক্তির বিকাশ চলে

সমগ্রভাবে নতুন সমাজ রূপলাভের বিভিন্ন ধাপ অনুযায়ী কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে।

নতুন মানুষের জন্ম জড়িত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ নির্মাণের সঙ্গে। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম দ্বারা, শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক মানবিক মর্মার্থের প্রবক্তারূপ বিপ্লবীর ব্যক্তিত্ব উদ্ভব দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক ধরনের ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ। মেহনতি বিপ্লবীর ব্যক্তিত্বে রূপ নিয়েছে নতুন মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গুণাদি, যা পরে সমাজতান্ত্রিক ধরনের ব্যক্তিত্বে পরিষ্ফুট হয়েছে। শোষণের অবসান করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানুষের সত্যকার মূর্তির পূর্বশর্ত গড়ে দেয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শূন্য হয় সমাজতান্ত্রিক ধরনের ব্যক্তিত্ব উদ্ভবের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি গড়ার উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া।

গুণগতভাবে নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলে সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষের স্থান, সামাজিক উৎপাদনে তার ভূমিকা, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ আর লোকেদের মধ্যকার সম্পর্কের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটায় সমাজতন্ত্র। দেখা দেয় ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নীতিগতভাবে নতুন সম্পর্ক, সেটাই সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির রূপলাভের ভিত্তি।

সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার দ্বিতীয় পর্যায় সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই পর্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক-শ্রেণীগত কাঠামো

চূড়ান্তরূপে আকার দেয় ও সংহত হয়। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব থেকে রাষ্ট্র পরিণত হয় সর্বজনীনে, দেখা দেয় সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের একই টাইপ — শ্রমসেবী, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের প্রকৃতিগত দিকগড়লি যাতে বিধৃত। নতুন মানুষের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হল বৈপ্লবিকতা ও নিয়মানুযায়িতা, সংগঠনশীলতা আর যৌথ মনোবৃত্তি।

নতুন মানুষ গড়ে ওঠার তৃতীয় পর্যায় সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ হবার পর্বের সঙ্গে জড়িত, এ সমাজে সমাজতন্ত্র বিকশিত হতে থাকে নিজস্ব, যৌথ ভিত্তির ওপর। এ সমাজে সমস্ত শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের নৈকট্য, শ্রেণীহীন কাঠামো রূপ নিতে থাকায় সামাজিক দিক থেকে একই রূপের ব্যক্তিত্ব, মদুস্ত স্বতন্ত্রসত্তা দেখা দেয়। এই পর্যায়েই সর্বজনীন বিকশিত ব্যক্তিত্ব গঠন একটা ব্যবহারিক কর্তব্য হিসেবে সামনে আসে। সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে নতুন মানুষ রূপ নিতে থাকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের মৌলিক কর্তব্য সাধনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে, কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ের সম্ভাবনা ও সমস্যার বাস্তব প্রেক্ষিতে। বৈষয়িক উৎপাদনের পরিধি বর্ধন, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সমাজতন্ত্রে অগ্রগতির একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হয়েই থেকে যায়, এবং তাতেই নির্ধারিত হয় মানুষের সামাজিক তাৎপর্য ও মূল্য।

সমাজতন্ত্র বলতে ধরে নেওয়া হয় যে ব্যক্তির সামাজিক জীবনের দুই ক্ষেত্রের মধ্যে বিরোধ দূর করে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে গৃহগতভাবে নতুন একটা

সম্পর্ক দেখা দিতে থাকবে। ব্যক্তির নিজস্ব জীবন, তার মৃত-নির্দিষ্ট গ্রিয়াকলাপ সামাজিক কর্মের মধ্যে মিলিয়ে না গিয়েও একটা সার্বিক সামাজিক অন্তঃসারে পূর্ণ হয়ে ওঠে, প্রতিফলিত করে সমাজজীবনের সাধারণ দিকগুলি।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অবজেকটিভ ভিত্তির রূপান্তর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একটা নির্ধারক তাৎপর্য ধরে। তবে এ প্রক্রিয়ায় স্বয়ং ব্যক্তির ভূমিকাও কম নয়। শোষণ সমাজের পরিস্থিতিতে মেহনতিরা ব্যক্তিত্বহীন। ব্যক্তিত্বের ধর্ম অর্জনে মানুষকে উঠতে হয় যে পরিস্থিতির দরুন সে ব্যক্তিত্বহীন তার উদ্বে। সমাজতন্ত্রে বিলুপ্ত হয় শ্রেণীগত ও জাতিগত বৈরিতা, সেই সঙ্গে রাষ্ট্র ও নাগরিকের স্বার্থের মধ্যে গরমিল। নতুন ন্যায়সঙ্গত সমাজ নির্মাণের সাধারণ লক্ষ্যে তাদের স্বার্থ তখন মিলে যায়।

সমাজতন্ত্র মানুষকে দেয় তার গুণবলি বিকাশের ব্যাপক সুযোগ, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ভান্ডার খুলে দেয়, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটিকে উপস্থিত করে নতুনভাবে। সমাজতন্ত্রের বড়ো একটা মূল্য এই যে তা দেয় শ্রমের অধিকার, ব্যক্তির ঝোঁক তার সামর্থ্য অনুসারে কাজ বেছে নেবার সুযোগ।

সমাজের সমস্ত সদস্যকে ব্যাপক রাজনৈতিক অধিকার দেয় সমাজতন্ত্র, কিন্তু লোকের শূন্য অধিকার ভোগ করলেই চলে না, সততার সঙ্গে নিজের কর্তব্যও পালন করতে হয়। সমাজ, যোঁথ আর ব্যক্তির যা স্বার্থ, তার

অভিন্নতা বোধই হল সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে ব্যক্তির জীবনের অবস্থানের ভিত্তি।

ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণতা আর সমৃদ্ধিতে ধরে নেওয়া হয় তার বিকাশে সামঞ্জস্য। সমাজতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের সুসমঞ্জস বিকাশের অত্যাৱশ্যক শর্ত হল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নতুন সম্পর্ক। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিধানে ধরে নেওয়া হয় মানসিক ও কার্যিক শ্রমের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের বিলোপ, সমাজের শ্রেণীহীন কাঠামোর রূপলাভ, পরিপূর্ণ সামাজিক সমতা।

সামাজিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিধানে বোঝায় ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বৈপরীত্য ঘটাৱ মতো সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তিরোধান। তবে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য মানে যোথের মধ্যে ব্যক্তির বিলয় নয়। পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত হবে একদিকে সামাজিক স্বার্থের অগ্রাধিকারে যা হরে দাঁড়াৱে ব্যক্তির স্বার্থের প্রধান বিষয়, অন্যদিকে সমাজের প্রতিটি সদস্যের, প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রযত্নে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে, সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ করার পর্যায়ে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের তিনটি ধারা চিহ্নিত করা যায়: কর্মীর গুণবর্ধন, নিকটসম্পর্কিত বৃত্তি অর্জন, জ্ঞানের ক্রমাগত নৱায়ন; শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ; স্বাবলম্বী ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সৃজনধর্মী ক্রিয়াকলাপের পরিধি প্রসার।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বাঙ্গীণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব গঠন

হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পূর্ণ করার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক কর্তব্য। শাসক কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান রণনৈতিক লক্ষ্য হল সোভিয়েত মানুষের অধিরত বর্ধমান বৈষয়িক ও আর্থিক চাহিদার সর্বাধিক পূরণ। এই লক্ষ্যটাই সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিকাশের মূলগত মর্মবস্তু, যা বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির দ্বরণ, অর্থনীতিকে প্রথর বিকাশের পথে আনয়ন, দেশের উৎপাদনী সম্ভাবনার আরো যুক্তিসঙ্গত সদ্যবহার, সমস্ত ধরনের সঙ্গতির সর্বাঙ্গীণ মিতব্যয় আর কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধির ভিত্তিতে সোভিয়েত লোকেদের আরো সচ্ছলতা বৃদ্ধির কর্তব্য পালন করছে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব গঠন সমাজতান্ত্রিক ধারায় জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সমাজতান্ত্রিক ধারায় জীবনযাত্রা হল সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট রূপ, মানুষের সামাজিক জীবনে অন্তর্ভুক্তির একটা উপায়। তাতে আত্মপ্রকাশ করে কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, তা রূপায়িত হয় লোকেদের জীবন, গ্রিয়াকলাপ ব্যবস্থার মধ্যে। সমাজতান্ত্রিক ধারায় জীবনযাত্রার সামাজিক মর্মার্থে থাকে সত্যকার যৌথ মনোবৃত্তি ও সখ্য, ঐক্য, দেশের সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার মৈত্রী, নৈতিক সদ্গুহতা, দেশাত্মবোধ আর আন্তর্জাতিকতাবাদ।

সমাজতান্ত্রিক ধারায় জীবনযাত্রার বৈষয়িক ও আর্থিক ভিত্তির সদ্দৃষ্টীকরণ আর নতুন মানুষের রূপলাভ

নিবিড়ভাবে পরস্পর বিজড়িত। লালনের সাফল্য নিশ্চিত হয় কেবল যখন তা সামাজিক-অর্থনৈতিক পালিসির পাকা ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়।

সদুসামঞ্জস্য বিকশিত ব্যক্তি সর্বদাই সামাজিকভাবে সক্রিয়, তার অবজেকটিভ শর্ত হল সামাজিক ব্যবস্থার গড়ন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক জগতের একটা নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি বলে মনে করে না, সে জগতের সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর সাধনের সক্রিয় কর্তা বলে তাকে দেখে। লেনিন লিখেছেন, ‘এই কথাটায় (= মানুষ) বোঝায় আত্ম রূপায়ণের, অবজেকটিভ জগতে নিজের মধ্য দিয়েই নিজেকে অবজেকটিভ করে তোলার, আত্ম প্রতিষ্ঠার (পূর্ণতা সাধনের) প্রয়াস।’* কেবল প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপেই, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ প্রক্রিয়াতেই ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা প্রকাশ পায় সর্বাধিক পূর্ণতায় এবং গুণগতভাবে নতুন একটা সামাজিক অন্তঃসার লাভ করে। বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বের অবজেকটিভ পরিস্থিতি বদলে দিয়ে মানুষ নিজেকেও বদলায়।

ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মূল্যধার হল শ্রম। সমাজতান্ত্রিক সমাজ শ্রমরত মানুষের সমাজ। সেই জন্যই সচেতন, সততাশ্রয়ী, উদ্যোগী শ্রম, সমাজের কল্যাণের জন্য শ্রমই হল সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির যোগ্যতা, সামাজিক মর্যাদার সর্বোচ্চ মাপকাঠি। শ্রম লোকেদের

* Lenin V. I. *Collected Works*.—Moscow: Progress Publishers, 1980, Vol. 38, p. 212.

মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের প্রধান রূপ, ব্যক্তিত্বের সামাজিক তাৎপর্য লাভের ভিত্তি।

বণ্টনের ক্ষেত্রটাও ব্যক্তিত্বের বিকাশে খুবই প্রভাব ফেলে। বণ্টনের সম্পর্কটা সোজাসুজি ও সরাসরি সবার ও প্রত্যেকের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। বণ্টনের চরিত্র আসলে সমাজতন্ত্রে যতটা সম্ভবপর সেরূপ সামাজিক সমতার মাত্রা নির্ধারণক অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা সূচক। সমাজতন্ত্রে বণ্টনের প্রধান মানদণ্ড হতে পারে কেবল শ্রম — তার পরিমাণ ও উৎকর্ষ। শ্রমের চরিত্রে পরিবর্তন (সমাজের প্রতিটি সদস্যের শ্রমে কার্যিক ও মানসিক, ব্যবস্থাপক ও পালনমূলক কাজের আঙ্গিক মিলন), বণ্টন ব্যবস্থার সম্পূর্ণীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরচর্চার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সূচীত হয় সামাজিক সমরূপিতার দিকে অগ্রগমন।

নতুন মানদণ্ড গড়ে তোলার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারিকা হল সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের অবিরাম প্রসার। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে নিশ্চিত হয় ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিস্থিতি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র উঠে এসেছে গুরুগতভাবে নতুন একটা ধাপে, রীতিমতো প্রসারিত হয়েছে সোভিয়েত নাগরিকের অধিকার। মেহনতিরা ক্রমেই বেশি সক্রিয়ভাবে যোগ দিচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের ক্রিয়াকলাপে, সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যাপারাদি চালনায়। এতে গড়ে উঠছে প্রতিটি লোকের সক্রিয় নাগরিক মনোবৃত্তি, সমাজতান্ত্রিক আইন লঙ্ঘনের প্রতি আপোসহীনতা।

বিপুল গুরুত্ব ধরে উৎপাদনের পরিচালনায় মেহনতিদের অংশগ্রহণ, উৎপাদনী গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে তাদের সক্রিয় ভূমিকা। উৎপাদনী কৰ্তব্যের সফল সমাধান সম্ভব কেবল নিজের শ্রমের প্রতি প্রত্যেকটি কর্মীর উদ্যোগী, সচেতন, আগ্রহান্বিত মনোভাবের পরিস্থিতিতে।

ব্যক্তির সামাজিক সক্রিয়তা প্রকাশ পায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রকৃতিগত হল তার সৰ্বজনীন চরিত্র, সমস্ত মেহনতির পক্ষে তার অধিগম্যতা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ সাংস্কৃতিক মূল্যগুণালিকে করে তুলেছে সৰ্বজনীন সম্পত্তি। এ অধিকার নিশ্চিত হয় রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ভাণ্ডারে রক্ষিত স্বদেশের ও বিশ্বের সাংস্কৃতিক সম্পদগুণালিকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে; দেশের সমগ্র ভূখণ্ডে সাংস্কৃতিক-জ্ঞানপ্রচারণী প্রতিষ্ঠানগুণালিকে বিকশিত করে ও সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে; টেলিভিশন ও রেডিও, পুস্তক প্রকাশ আর সাময়িক পত্র, বিনামূল্য গ্রন্থাগারাদির জাল বিস্তার করে; বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় বাড়িয়ে তুলে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ আর তাতে ব্যক্তির আরো বিকাশ ঘটবে সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্মের জন্য প্রয়োজনবোধের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে। আর এই সৃষ্টিকর্ম হল অখণ্ড, সৰ্বতঃসক্রিয় সত্তা হিশেবে ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

ব্যক্তির ক্রমেই পরিপূর্ণতর বিকাশের পক্ষে বিপুল বৈষয়িক ও আর্থিক সুযোগ আছে সোভিয়েত

ইউনিয়নে, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে। তবে প্রত্যেকেই যাতে সেটা বিবেচনা করে কাজে লাগাতে পারে, সেটা দেখা দরকার। আর তা নির্ভর করে ব্যক্তির আগ্রহ ও চাহিদার ওপর। ব্যক্তির চাহিদা হয় বৈষয়িক, সামাজিক আর আত্মিক।

লোকের বৈষয়িক চাহিদাকে কেবল বৈষয়িক সম্পদের পরিভোগে সীমিত করা চলে না। তার মধ্যে পড়ে অস্তিত্বের বিশিষ্ট মানবিক রূপের জন্য চাহিদা এবং সর্বাপ্রাণে শ্রমের জন্য মানুষের বৈষয়িক চাহিদা। শ্রমের জন্য, সচেতন সৃজনশীল শ্রমের জন্য মানুষের সর্বতোষিকশিত চাহিদা ছিল এবং রয়ে গেছে মানুষের প্রধান বৈষয়িক চাহিদা, তার জীবন ও ক্রিয়াকলাপের মূলক্ষেত্র।

সামাজিক চাহিদা হল জীবনের নির্দিষ্ট একটা ধারা, সামাজিক সম্পর্কের, রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য চাহিদা। ব্যক্তির সামাজিক চাহিদার একটা মূর্তিনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সারমর্ম থাকে আর সে চাহিদা মেটে মানবিক সমাজ বিকাশের মাত্রা অনুসারে।

আত্মিক চাহিদা হল শিক্ষা-দীক্ষা, নৈতিকতার, নান্দনিক ও সাধারণ সাংস্কৃতিক বিকাশের চাহিদা।

বিচক্ষণ চাহিদার প্রশ্ন হল ব্যক্তির বৈষয়িক, সামাজিক ও আত্মিক চাহিদার স্ফুটন মিলনের প্রশ্ন, চতেনা ও ক্রিয়াকলাপে সৃজনী প্রেরণার বিকাশ, সমৃদ্ধ সামাজিক লক্ষ্যের জন্য প্রয়াস।

ব্যক্তির বিচক্ষণ চাহিদা বিকাশের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অনেক কিছু করা হচ্ছে: প্রবর্তিত হয়েছে

বাধ্যতামূলক সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা, যা নিত্যান্ত
প্রয়োগমূলক নয়, বহুমুখী; সামাজিক ন্যায়ের দাবি
অনুসারে গড়ে উঠছে লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক, তাদের
জীবনধারা; প্রস্ফুরিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র,
জীবনযাত্রা ও অবকাশ যাপনের সুসভ্য ধরন উন্নত
হচ্ছে। সর্বতোবিকশিত ব্যক্তিত্বের রূপলাভ
সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের একটা অবজেকটিভ নিয়ম।
সমাজের এবং খোদ মানুষের বিকাশের যে চাহিদা তা
মেটানো হচ্ছে এই নিয়মসঙ্গতিতেই।

তৃতীয় অধ্যায়

বাস্তব সমাজতন্ত্র

ও বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

১। সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা

বিশ শতকের মধ্যভাগের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গঠন, বিশ্বে সামাজিক-শ্রেণীগত শক্তির অনুপাত তাতে পরিবর্তিত হয়েছে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে। মেহনতিদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে ইউরোপ, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার একসারি দেশে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের উচ্ছেদ হয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় একটা আপাতক ঘটনা বা বাইরে থেকে আসা কোনো ব্যাপার নয়। বিপ্লবের 'রপ্তানি' সম্ভব নয়, কেননা এক-একটা দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দেখা দেয় অভ্যন্তরীণ শ্রেণী বিরোধ বৃদ্ধির ফলে।

এইসব দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটা জিনিস ছিল সাধারণ — উৎপীড়িত আর উৎপীড়কদের মধ্যে সংগ্রামের চূড়ান্ত বৃদ্ধি। এইসব দেশের

প্রত্যেকটিতে শোষণের বিরুদ্ধে মেহনতিদের সংগ্রাম যুক্ত হয়েছিল জার্মান ফ্যাসিজম আর জাপানি সমর-বাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের সঙ্গে। তাতে সাহায্য করে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর সার্থক ক্রিয়াকলাপ, যা ফ্যাসিস্ট দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ইউরোপের অনেক জাতিকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ফ্যাসিজমকে চূর্ণ করার সোভিয়েত ইউনিয়ন যে নির্ধারক ভূমিকা নেয়, তাতে প্রতিপাদিত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরাক্রম। সারা বিশ্বের জনগণ দেখল যে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসক সামরিক যন্ত্রকে প্রতিরোধের ক্ষমতা ধরে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের দিকে মেহনতিদের সহানুভূতি ও উন্মুখতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে বহু দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্টবিরোধী শক্তিগগুলির বিজয়ের একটা পরিণাম হল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব।

ইউরোপের মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল এবং এশিয়ার দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের রূপ হয়ে দাঁড়ায় জন-গণতন্ত্র। এ শতকের ৫০-এর দশক নাগাদ জন-গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্পের জাতীয়করণ হয়, সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ঘটে আমূল সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন, অবসান হয় শোষণের। জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশে সূদৃঢ় হয় যেমন প্রতিটি দেশের অর্থনীতি, তেমনি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কও। ইতিহাসের দিক থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে উঠল সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা।

তার রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য কী? সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি একই — উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক, সমাজতান্ত্রিক মালিকানা। রাজনৈতিক ক্ষমতা মেহনতিদের হাতে, তা কার্যকৃত হয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা দি মারফত। অন্তর্ধান করেছে শ্রেণীগত ও জাতীয় শত্রুতা। জাতি নির্বিশেষে লোকেদের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে সখ্য, মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্ক।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতির ওপর। নিজ নিজ উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি দেশই সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার বিকাশ ও সংহতিতে অবদান যোগ করে। এইভাবে জাতীয় স্বার্থ মেলে আন্তর্জাতিক স্বার্থের সঙ্গে।

সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের অন্তিম লক্ষ্য হল শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ গঠন।

১৯৪৯ সালে গঠিত হয় পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদ, 'কমেকন'। এটি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আন্তঃরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সংগঠন। বর্তমানে ১০টি রাষ্ট্র আছে 'কমেকনে'। এ সংগঠনের লক্ষ্য হল সহযোগিতার বর্ধন ও সম্পূর্ণকরণ, দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশ, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির ছরণ, স্বল্পপরিণত দেশগুলির শিল্পায়নের মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক বিকাশকে কাছাকাছি এনে

সমমাত্রায় উত্তোলন আর জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াস।

এ পরিষদের ক্রিয়াকলাপ চালিত হয় তার নিয়মাবলি অনুসারে এবং মিলিত পরিকল্পনা, উদ্যোগাদি নির্মাণ, উৎপাদনের বিশেষীকরণ ও সমবায়, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সহযোগিতা নিয়ে বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে। তার ক্রিয়াকর্মের প্রধান ধারা হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভূতির সামূহিক কর্মসূচির রূপায়ণ। এ সংগঠনের সর্বোচ্চ সংস্থা হল অধিবেশন, কার্যনির্বাহী সংস্থা — কার্যনির্বাহী কমিটি, প্রশাসনিক নির্বাহক সংস্থা সেক্রেটারিয়েট। সেক্রেটারিয়েটের অবস্থান সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কোয়। পর্যবেক্ষক হিসেবে পরিষদের সংস্থাটির কাজকর্মে অংশ নেয় আরো কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশ। কতকগুলি পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গেও সহযোগিতা চালায় পরিষদ।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিকশিত হয় সমতা, শ্রদ্ধা, স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব, সহযোগিতা আর পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে। এইরূপ সম্পর্কেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মেহনতিদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ মেটে।

পুঁজিতন্ত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা চলে প্রবল কতৃক দুর্বলকে পীড়ন ও অধীনকরণের মাধ্যমে, স্বল্পবিকশিত দেশগুলিকে পুঁজিতন্ত্রের জন্য কৃষিদ্রব্য ও কাঁচামাল সরবরাহের

লেজুড়ে পরিণত ক'রে। এই পলিসিতে সদ্যোমুদ্রিত দেশগুলির বিকাশ আটকে থাকে, তাদের অর্থনৈতিক, টেকনিকাল ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা বজায় রাখার পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বাজার, কাঁচামালের উৎস, পুঁজি লগ্নির ক্ষেত্রের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে বিরোধ হয়ে ওঠে তীব্র। তাই দেশগুলির মধ্যে ন্যায্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না পুঁজিতন্ত্র।

কেবল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কই নিশ্চিত করে নতুন ধরনের জাতীয় অর্থনীতি। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ মেলে জাতিগুলির নৈকট্য বিধানের সঙ্গে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ চলে জাতীয় রাষ্ট্রিক কাঠামো বজায় রেখে। তবে প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র হলেও কেবল নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থেই দরজা এঁটে থাকে না। উৎপাদনী শক্তি বিকাশের প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের ঐক্যে তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরস্পরের কাছাকাছি এসে যায়। দেখা দেয় গোটা ব্যবস্থার পরিসরে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশকে পরিকল্পিত, সুসমন্বিত করার আবশ্যিকতা।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের প্রথম পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদি, পরে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য চুক্তি, বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ নির্মাণে বেশি বিকশিত দেশগুলির পক্ষ থেকে ক্রেডিট ও সাহায্য দানের মতো অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে

কার্যে পরিণত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাগের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ পরিকল্পনাদির সরাসরি সমন্বয়।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতায় যে শ্রম বিভাগ, সেটা পূর্জাতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে অনুরূপ সম্পর্ক থেকে আমূল পৃথক। প্রথমোক্তের ভিত্তিতে থাকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির স্বেচ্ছাধীন সহযোগিতা। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাগের চরিত্র পরিকল্পনামূলক। তাতে বিবেচিত হয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতির সামূহিক বিকাশ। এক-একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতি হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আঙ্গিক অংশ। সহযোগিতায় প্রতিটি দেশের পক্ষে সম্ভব হয় অর্থনীতির যে শাখাগুলির পক্ষে সেখানে সবচেয়ে অনুকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান, সেগুলির বিকাশ সাধন।

এক-একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে বিক্রি হয়। সমাজতন্ত্র বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে রূপ নেবার প্রথম পর্যায়ে কিছুর সমাজ-তান্ত্রিক দেশে শিল্প ছিল না, অথবা প্রায় ছিল না। এখন সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশেই আধুনিক মানের শিল্প গড়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের পরিস্থিতিতে বহুশাখা বিকাশ রূপায়িত হচ্ছে উৎপাদনের বিশেষীকরণ ও সমবায় বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমে। ছোটো ছোটো যেসব দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার বড়ো নয়, তাদের ক্ষেত্রে উৎপাদনের বিশেষীকরণ ও সমবায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক-একটা দেশের জাতীয়

অর্থনৈতিক কমপ্লেক্স পরস্পরের পরিপূরণ করে সমাজ-
তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। সেটা প্রকাশ পায়
মেহনতিদের জীবনযাত্রার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক
মানের উন্নয়নে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদনী ও
বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সম্ভাব্য শক্তির প্রসারে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতির উচ্চ মান
নির্ধারিত হয় উৎপাদনে শক্তি সরবরাহ ও টেকনিকাল
সজ্জার মাত্রা দিয়ে। যেমন, বিগত দশ বছরে শিল্প-
শ্রমে শক্তি যোজনা বুলগেরিয়ায় বেড়ে উঠেছে ৬০,
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ২১, মঙ্গোলিয়ায় ৭৭,
সোভিয়েত ইউনিয়নে ৩৪ শতাংশ। শুরুর হয়েছে হাজার
হাজার নতুন ধরনের সাজসরঞ্জাম, কলকব্জা,
স্বয়ংক্রিয়তার যন্ত্রপাতির উৎপাদন।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাগে
সমাজতান্ত্রিক অঙ্গীভূতির চৌহদ্দির মধ্যে উৎপাদনী
শক্তির এমন বণ্টনের ব্যবস্থা হয় যাতে এক-একটা দেশের
প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক ফলপ্রসূ সদ্ব্যবহার ঘটে।
সর্বাধিক গুরুত্ব ধরে কৃষি উৎপাদনের বিশেষীকরণ।
এক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক
পরিস্থিতি হিসেব রাখা হয়।

এইভাবে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাগে
একপেশে বিকাশ ঘটে না সমাজতান্ত্রিক দেশের
অর্থনীতির। অর্থনীতির সামূহিক বিকাশে সাহায্য
হয় তাতে, জাতীয় অর্থনৈতিক কমপ্লেক্সগুলি
সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিটি দেশের স্বার্থের
সঙ্গে সংযোজিত হয়।

বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লব তার ছাপ ফেলে সমাজ-তান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থারও ওপর, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সহযোগিতা বিকশিত ও প্রসারিত করে। অগ্রণী অভিজ্ঞতার বিনিময় করে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা, পরস্পরের মধ্যে দেয়া-নেয়া হয় টেকনিকাল দলিলাদির, তৈরি করা হয় সুশিক্ষিত কর্মীদের, বিশেষজ্ঞদের আদান-প্রদান চলে, সহযোগিতা করা হয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যায় ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চালায় তারা, পারমাণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে, মহাকাশ জয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। 'ভেগা' প্রকল্প* কার্যকৃত করায় অংশ নেন বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশেষজ্ঞরা।

অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার আরো বিকাশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ঐক্য ও সহযোগিতার সংহতি প্রভূত গুরুত্ব ধরে। সেইজন্য সমাজতন্ত্রের শত্রুরা সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত দেশগুলির ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক ঐক্য ধ্বংসে প্রয়াসী। ভাবাদর্শীয় অন্তর্ঘাতের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে একাধিকবার।

পুঁজিতন্ত্রের আধিপত্য ক্রমাগত সংকীর্ণ হয়ে আসার

* 'ভেগা' ('শুক্লগ্রহ — হ্যালির ধূমকেতু') প্রকল্প — মহাজাগতিক যন্ত্রের সাহায্যে সৌরমণ্ডল গবেষণার অতি জটিল একটি প্রকল্প, শুক্লগ্রহ এবং হ্যালি ধূমকেতুর মূলাংশ নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয় তাতে।

পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিপক্ষে সামাজিক পরিবর্তন প্রতিরোধে সর্বোপায়ে চেষ্টিত। ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা নিজেদের ভাবাদর্শ চাপিয়ে দেবার নমনীয়, সুক্ষ্ম সব উপায়ের খোঁজে আছে। বর্জোয়া ভাবাদর্শীরা সমাজতন্ত্রকে ধিক্কৃত, হেয় করার জন্য সচেষ্ট, তার সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব চাপা দিতে চায়; চূর্ণ করতে চায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের ঐক্য আর মৈত্রী; সাম্রাজ্যবাদের উন্মাদ অসুস্থসজ্জা আর আগ্রাসক নীতিকে সঙ্গত বলে দেখাবার অভিলাষী তারা।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোজাসুজি হস্তক্ষেপেরও আশ্রয় নেয় সাম্রাজ্যবাদীরা। সমাজতান্ত্রিক পথে নিজেদের স্বাধীন বিকাশের অধিকার রক্ষায় ভিয়েতনামকে কয়েক বছর ধরেই মার্কিন আক্রমণকে প্রতিহত করতে হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণ যে বিজয় লাভ করল তাতে দেখা গেল যে প্রগতিশীল ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। নিজেদের স্বাধীনতার জন্য ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ভিয়েতনামী জনগণের পক্ষে দাঁড়ায় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশেরা, সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার ভূমিকা অবিরাম বেড়ে চলেছে: পুর্জিতান্ত্রিক দেশগুলিতে জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ওপর, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের

ওপর, বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিকাশের ওপর তা সদর্থক প্রভাব ফেলেছে।

২। সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিতন্ত্রের দ্বন্দ্বিতা

বর্তমান ঐতিহাসিক যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে বিশ্বে রয়েছে দুটি বিপরীত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — পুঁজিতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক। উভয়েই বিকশিত হচ্ছে নিজ নিজ নিয়ম অনুসারে, লক্ষ্য তাদের এক নয়। সেই সঙ্গে বিশ্ব ব্যবস্থা দুটির প্রত্যেকটির যা পার্থক্য, তাতে তাদের সম্পূর্ণ পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার আবশ্যিকতা সূচিত হয় না।

দুই ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এইজন্য যে একদিকে, পুঁজিতন্ত্র বিকশিত হচ্ছে অসমান গতিতে, অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পরিস্থিতি সমস্ত দেশে একই সময়ে পেকে ওঠে না। সেই জন্য বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির দীর্ঘ সহাবস্থানের একটা পর্ব অনিবার্য। লেনিন কর্তৃক নির্ণীত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টিদের দ্বারা বিকশিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্বটি বর্তমান জগতে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের যে প্রক্রিয়া, সেগুলির প্রগাঢ় উপলব্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

পুঁজিতন্ত্র বিশ শতকের গোড়ায়, এমনকি তার মধ্যভাগেও যা ছিল, বর্তমান পুঁজিতন্ত্র এখন তা থেকে বহু দিক দিয়ে পৃথক। তার আধিপত্যের ক্ষেত্র

যেভাবে সংকুচিত হচ্ছে, সেটা আর ফেরার নয়। সাধারণ সংকটের পর্যায়ে প্রবেশের পর পদ্ধতিগত সেটা ঠেকাতে অক্ষম। বেশ কতকগুলি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে গড়ে উঠেছে অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা। জাতীয় মদ্যুত্তীর্ণ সংগ্রামের পরিণামে ধ্বংস পড়েছে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা। বর্জোয়া রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, কিছুই এসব প্রক্রিয়াকে রোধ করতে সক্ষম নয়। মানবিক বিকাশের রাজপথ এখন পেতে দিচ্ছে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী, সমস্ত বৈপ্লবিক, প্রগতিশীল শক্তি।

অর্থনীতির দুই ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একটা জটিল সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বোঝায় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিতর্কমূলক প্রশ্নগুলি সমাধানের উপায় হিসেবে যুদ্ধ বর্জন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেগুলির গমীমাংসা; সমানাধিকার, পারস্পরিক বোঝাপড়া, পরস্পরের স্বার্থ স্বীকার; প্রতিটি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনভাবে নিজেদের দেশের ব্যাপারাদির স্থির করার অধিকার; সার্বভৌমত্ব ও ভূভাগের অখণ্ডতা মান্য করা, প্রতিটি রাষ্ট্রের সীমানার অলঙ্ঘনীয়তা, সমতা আর পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিকাশ।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির একটি মূল্য হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষ থেকে নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে অবিরাম তৎপরতা। নিরস্ত্রীকরণ সমস্ত রাষ্ট্রের

শান্তি ও নিরাপত্তার পাকা গ্যারান্টি, সমস্ত দেশের, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিরও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিপুল বৈষয়িক সম্পদের মূল্য। বর্জ্যেয়া ভাবাদর্শীরা দেখাবার চেষ্টা করে যে অস্ব প্রতিযোগিতা নাকি 'অর্থনৈতিক প্রস্ফুরণের' উপায়, নিরস্ত্রীকরণে অর্থনীতির ক্ষতি হবে। বাস্তব অবস্থায় খণ্ডিত হয় তাদের যুক্তি: সাময়িক ব্যয় বৃদ্ধিতে শিল্পোৎপাদনের কেবল একটা সাময়িক প্রসার ঘটেতে পারে। শেষ বিচারে অর্থনীতির সাময়ীকরণে শান্তিপূর্ণ শাখাগুলি থেকে পুঁজিলগ্নি সরে গিয়ে, অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষম চাহিদা সংকুচিত হয়ে পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে পরিণামে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়। শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চিতি হল বাজারের সুস্থিরতা, সমস্ত দেশের কাঁচামাল আর শক্তির চাহিদা মেটাবার গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শর্ত। সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির দেশেরা সমতা ও পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যের শান্তিপূর্ণ বিকাশে চেষ্টা করত।

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রশ্নে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখা যায় দু'টি প্রবণতা: একটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিকাশের পক্ষে, অন্যটা বিপক্ষে। তবে পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বহিঃঅর্থনৈতিক পলিসি প্রভাবিত হয় পুঁজিতান্ত্রিক সমাজবিকাশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায়, তার অর্থনৈতিক অবস্থায়, সেই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য মণ্ডল

সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ তার ক্রিয়াকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে দুই বিশ্ব ব্যবস্থার সহাবস্থান ও প্রতিযোগিতার প্রবল প্রভাবের কবলিত হয়। সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হয় নতুন আন্তর্জাতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের বৃদ্ধি একদিকে পুঁজিতান্ত্রিক শক্তির শাসকমহলগুলিকে ঠেলে দেয় সমাজতান্ত্রিক দেশেদের সঙ্গে সহযোগিতার দিকে, পক্ষান্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সে সংকটকে কাজে লাগায় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে।

বার্ণাজ্যিক-অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পুঁজিতান্ত্রিক পার্টনারদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। অন্যান্য দেশগুলির চেয়ে এই বৃহৎ শক্তিটির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বেশি ভোগে। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের অবস্থান দুর্বল করার প্রয়াসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকমহল অর্থনৈতিক হাতলগুলিকে কাজে লাগায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক দেশে চালান নিষিদ্ধ করে রচিত হয় তথাকথিত স্ট্র্যাটেজিক পণ্যদ্রব্যের একটি তালিকা, নিয়ন্ত্রিত পণ্যেরও একটা ঢালাও ফর্দ করা হয়। সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করার ভয় দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ন্যাটো সহযোগীদের বাধ্য করে সমাজতান্ত্রিক দেশে স্ট্র্যাটেজিক পণ্য না পাঠাতে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে আমদানিও সীমিত হয়। জাতিগুলিকে সর্বাধিক অনুকূল্য দানের বাণিজ্য ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রসারিত করা নিষিদ্ধ করে আইনও পাশ হয় তখনই।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক অবরোধের উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতির যুদ্ধপরবর্তী পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি পুঁজিতান্ত্রিক বাজারে কেনার সুযোগ না দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ আটকে রাখা।

এরূপ পলিসিতে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা বাধ্য হয় অর্থনৈতিক বিকাশের নিজস্ব সম্পদের ওপর নির্ভর করতে। নিষেধের মার্কিন পলিসি ব্যর্থ হয়। শূন্য তাই নয়, এ পলিসিতে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির পক্ষ থেকেও প্রতিরোধ জাগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে তাদের কাছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিকাশ ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৭০-এর দশকে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কে রেষারেষি হ্রাস পাওয়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যে যথেষ্ট অগ্রগতিতে সুবিধা হয়। বড়ো বড়ো মার্কিন ফার্ম অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের দেশগুলিতে তাদের এজেন্সি খোলে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য-শিল্প প্রদর্শনী ও মেলায় সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়। কিন্তু ৭০-এর দশকের শেষ থেকে পুনরায় সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে একসারি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাস্তব জীবনে যা দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক সহযোগিতা সীমিত করার

পার্লিসিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসান ছাড়া লাভ হয় না কিছই। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্প সাজসরঞ্জামের রপ্তানি সংকুচিত করায় চুক্তি বাবদ মার্কিন ফার্মগুলির খোয়া গেছে ২৮ কোটি ডলার। তাছাড়া ভবিষ্যতে সম্ভাব্য চুক্তির ১০০ কোটি ডলারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হারায়। মার্কিন ফার্মগুলি যেসব বরাত মেটাতে পারে নি, সোভিয়েত ইউনিয়ন তা স্থানান্তরিত করে পশ্চিম ইউরোপে।

সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের তাৎপর্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যদি-বা কমই থেকে গিয়ে থাকে, তাহলেও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির কাছে কিন্তু এর বেশ গুরুত্ব আছে। 'বারোয়ারি বাজার' আর পরিষদভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য লক্ষণীয় রকম তেজি হয়ে উঠেছে। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে তাদের ভেতর পণ্যাবর্তন বেড়ে উঠেছে ২৫ শতাংশ। সেই সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন নতুন রূপ: শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায়, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল যোগাযোগ, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের পরিস্থিতিতে উৎপাদনী শক্তির বর্তমান বিকাশমাত্রা অনুসারে পার্টনারদের স্বার্থসঙ্গত পরস্পর পরিশোধক চুক্তি।

পশ্চিমের সঙ্গে বাণিজ্যে সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলির প্রধান পার্টনার ফ্রান্স। শিল্পোদ্যোগে সমবায় বিকাশে তা সক্রিয় অংশ নেয়, এতে তারা দেখে তাঁর মাল রপ্তানি আর শক্তি এবং কাঁচামাল ধরনের পণ্য আমদানি প্রসারের একটা উপায়।

ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্র আর সমাজতান্ত্রিক দেশেদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সহযোগিতার চুক্তিগতালির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে গ্যাস পাবার বিনিময়ে ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্র সেখানে পাঠায় বৃহৎ ব্যাসার্ধের পাইপ। ধাতুশিল্পের ক্ষেত্রেও কারবারি সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে বৈদ্যুতিক-ধাতব কারখানা আর উদ্যোগ-সমাহার নির্মাণে অংশ নিচ্ছে পশ্চিম জার্মানির বড়ো বড়ো ফার্ম।

বহু পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের মতো ইতালির অর্থনীতিও বিশ্ব বাজারের সঙ্গে খুবই জড়িত, তার ওপর একান্ত নির্ভরশীল। এই কারণে ইতালির কারবারি মহল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগাযোগ সন্ধানে বাধ্য হয়।

অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের মতো ইতালিও সোভিয়েত প্রাকৃতিক গ্যাস. পাবার বিনিময়ে সেখানে গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের বহুমুখী প্রকল্পগুলিতে সক্রিয় অংশ নিচ্ছে। বৈকাল-আমদুর রেল সড়ক আর তোর্গলিয়াস্তি মোটর কারখানা নির্মাণে যোগ দিয়েছিল ইতালীয় ফার্মগুলি, রসায়ন আর লৌহজাতীয় ধাতুশিল্পে তারা কাজ করেছে পরিশোধের ভিত্তিতে। হার্জেরির সঙ্গে একত্রে টার্বোজেনারেটর, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সূতাকল উৎপাদনের জন্য মেশিন-টুল্‌স প্রস্তুতির চুক্তি হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক
 স্বাভাবিক করার পথে ব্রিটেন আসে সবচেয়ে শেষে।
 সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি
 যেসব চুক্তি করেছে তার মধ্যে রয়েছে সোভিয়েত পাইপ
 লাইনের জন্য ২১টি টার্বাইন পাঠানো, একত্রে ইঙ্গ-
 হাঙ্গেরীয় কম্পিউটার যন্ত্র উৎপাদন, রুমানিয়ায় জেট
 বিমান নির্মাণের কথা। তবে মোটের ওপর
 সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক
 সহযোগিতা সীমাবদ্ধ ধরনের, যথোচিত বিকশিত নয়।

ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য
 সমাজতান্ত্রিক দেশের মৈত্রী ও সহযোগিতা অবিরত
 বেড়ে চলেছে। পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলির মধ্যে
 ফিনল্যান্ডই প্রথম 'কমেকনের' সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তি
 করে। এ সহযোগিতার ফিন কমিশনের পাঁচটি গ্রুপ
 আছে: যন্ত্রনির্মাণ, রসায়ন শিল্প, পরিবহণ, বহির্বর্ণিগজ্য
 আর বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সহযোগিতা নিয়ে। মোট
 ২২টি চুক্তি হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজনীয় শক্তির ৭০
 শতাংশ ফিনল্যান্ড মেটায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে
 পাঠানো প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল আর পরিশুদ্ধ
 ইউরেনিয়াম দিয়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে ফিনল্যান্ডে গড়া
 হয়েছে তাদের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ স্টেশন আর
 উত্তর ইউরোপের বৃহত্তম ধাতু কারখানা। জল পরিষ্কার
 করার যে টেকনোলজি সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা রচনা
 করেছেন, ফিন ফার্মগুলি তা সাফল্যের সঙ্গে কাজে
 লাগাচ্ছে। বুলগেরিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,

হাঙ্গেরি আর চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে একসারি চুক্তি হয়েছে ফিনল্যান্ডের। ইউরোপীয় মহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করায়, শান্তির জন্য সংগ্রামে ফিনল্যান্ড সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে।

ইদানীং পরিষদভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক দ্রুত বেড়ে উঠছে। এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই ঘটনাটা যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চলে জাপানের কাছাকাছি এলাকায় জ্বালানির কাঁচামাল রূপে ব্যবহার্য সম্পদগুলি আয়ত্ত করার কাজ শুরু হচ্ছে। এখানকার নতুন শিল্পকেন্দ্রগুলিও আবার জাপানি পণ্যের নির্ভরযোগ্য বাজার হতে পারে। এসবের ফলে নির্ধারিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে জাপানের বহিঃরাজনৈতিক পলিসি।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে জাপানের অর্থনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক জাপানি মাল রপ্তানির ওপর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা বাতিল হয়েছে। জাপানি সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে রপ্তানি ক্রেডিট দেবার শর্ত পুনর্বিবেচিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আর জাপানের মধ্যে পণ্যবর্তন ১০ বছরে বেড়ে উঠেছে ও গুণেরও বেশি। জাপানের কারবারি মহলেরা তাদের নিকটতম প্রতিবেশী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পরস্পর লাভজনক বহুমুখী সহযোগিতা প্রসারের পক্ষে। সহায়তা পরিষদভুক্ত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্কে মৃদুশীল হয় তাদের ভৌগোলিক দূরত্ব,

পরিবহণে বেশি খরচার দরুন। তাই বৃদ্ধি পাচ্ছে সহযোগিতার নতুন ধরন: উৎপাদনী সমবায়, মিশ্র উদ্যোগ, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিনিময়।

সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বর্তমানে যে মাত্রায় পৌঁছেছে, তাতে তাদের মধ্যে পরস্পর লাভজনক সম্পর্ক আরো বাড়িয়ে তোলার ভিত্তি পাওয়া গেছে।

সমাজতান্ত্রিক আর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধ দূর হয় না। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের সহাবস্থান হল রাজনীতি, অর্থনীতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের একটা বিশিষ্ট রূপ। বহিনীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক ক্রিয়া সমন্বয়ের রূপ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অর্থনীতির মতো এক্ষেত্রেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখা চলে। আর ভাবাদর্শের কথা ধরলে, সমাজজীবনের এ ক্ষেত্রটার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হতে পারে না, কেননা যেকোনো আপোসেরই পরিণাম হয় নতিস্বীকার, নীতিগত, শ্রেণী-গত অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার বিপদ থাকে তাতে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হল সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিত্তি। দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রধান ক্ষেত্র হল শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা। সমাজতন্ত্র জয়লাভ করেছে যেসব দেশে তাদের অধিকাংশই অতীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে পিছিয়ে ছিল। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামনে কর্তব্য

দাঁড়ায় বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণে, অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রা আর অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সমপর্ষ্যে ওঠা এবং পরে তাদের ছাড়িয়ে যাওয়া।

দুই ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল অর্থনৈতিক বিকাশের গতিবেগ। উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা, জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পনা ও পরিচালনার কেন্দ্রীকরণের ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতি বাড়তে থাকে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির চেয়ে বেশি দ্রুতবেগে। পরিণামে এতে সমস্ত মূলগত অর্থনৈতিক সূচকেও উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়া সমাজতন্ত্রের পক্ষে সম্ভব হবে। বিগত ১৫ বছরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিকাশের বার্ষিক গড় বৃদ্ধিহার ছিল উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় ২.৭ গুণ বেশি, বৃদ্ধিহারগুলি হল যথাক্রমে ৬.৫ ও ২.৪ শতাংশ। এই সময়টায় 'কমেকন'-ভুক্ত দেশগুলির শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ বছরে গড়ে ৯.০% হারে বেড়ে ওঠে ৯০ শতাংশের বেশি, যেখানে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির বৃদ্ধিহার ছিল ৪.৮ শতাংশ। বিশ্বের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির প্রায় ৫০ শতাংশই পড়ে 'কমেকন'-ভুক্ত দেশগুলির ভাগে।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কেবল হারেই নয়, উৎপাদনী সম্ভাব্যতা কাজে লাগাবার মাত্রাতেও সমাজতন্ত্র তার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে। উৎপাদননী ক্ষমতার অপূর্ণ প্রয়োগ, বেকারি, অতুৎপাদন সংকট, পুঁজিতন্ত্রের যা প্রকৃতিগত,

তা এসব দেশে অজ্ঞাত। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক বিকাশের উচ্চ হার, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সম্ভাব্যতার বৃদ্ধি, বিপুল প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ, অভ্যন্তরীণ বাজারের বিপুল ধারকত্ব এই সাক্ষ্য দেয় যে পুর্জিতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের বিজয় অবশ্যস্বাভাবী।

উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের জাতীয় মর্দুস্তি সংগ্রামে একটা বাস্তব দিশারি হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুর্জিতন্ত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের সাফল্য। সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে বিশ্বের ঘটনাধারাকে বিজয়ী সমাজতন্ত্র প্রভাবিত করবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের, সর্বাগ্রে তার অর্থনীতির সফল বিকাশের মাধ্যমে।

৩। উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা

বর্তমান দুনিয়ায় জাতীয় ও সামাজিক মর্দুস্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য জনগণের সংগ্রাম একটা অবজেক্টিভ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।

রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবে শুরুর হয় মর্দুস্তিসাধক বিপ্লবগুলির যুগ। ১৯১৮ সালে নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের বহির্নীতিগত কর্তব্য প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছিলেন: ‘সর্বাগ্রে অগ্রণী দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমর্থন... সাধারণভাবে সমস্ত দেশেই, বিশেষ করে উপনিবেশ ও

পরাদীন দেশে গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমর্থন।*

সামাজিক সম্পর্কের একটা নতুন ব্যবস্থা হিশেবে সমাজতন্ত্র জাতীয় সমস্যা সমাধানের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। অন্যান্য দেশের জনগণের সঙ্গে সমাধিকারভিত্তিক সম্পর্ক স্থাপন করে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, উপনিবেশের জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা তর্কাতীতভাবে দেখিয়ে দিল যে সামাজিক ও জাতীয় মুক্তি পরস্পর থেকে অবিচ্ছেদ্য।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের ফলে সূচিত হয় সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিজমের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ে তা সূতীর হয়ে সম্পূর্ণ হয় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ধ্বংসে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় শতাধিক নবীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে। তবে সত্যকার মুক্তি লাভে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা কেবল প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। সদ্যোমুক্ত নবীন রাষ্ট্রগুলি তখনো থেকে যায় পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক পুঁজিতান্ত্রিক শ্রম বিভাগে তাদের কৃষি-কাঁচামালের জোগানদারি, পরনির্ভরতা আর পশ্চাৎপদতা

* Lenin V. I. *Collected Works*.—Moscow Progress Publishers, Vol. 27, pp. 157-158.

আপনা থেকেই দূর হয় না। মুক্ত দেশগুলির স্বাধীনতা সংহত হতে দেয় না সাম্রাজ্যবাদীরা। আগের মতোই তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দখল রাখা, নিজেদের রণনৈতিক লক্ষ্যে তাদের ভূখণ্ডকে ব্যবহার করার জন্য তারা হাজার হাজার উপায় আর ফন্দির আশ্রয় নেয়।

অন্যান্য দেশ ও জনগণকে শোষণের জন্য কেবল তাদের অর্থনৈতিক অধীনতাকেই কাজে লাগায় না সাম্রাজ্যবাদ, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য চেষ্টিত জনগণের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগেও ক্ষান্ত হয় না। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী অভিসন্ধির বিরোধিতা করে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা। সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি, তার অর্থনৈতিক পরাক্রম বেড়ে ওঠার ফলে বিশ্বের শক্তি অনুপাতে বদল ঘটছে, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিস্তার লাভের পথে বাধা দেখা দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে নতুন অর্থনৈতিক বোগাযোগ গড়ে তোলায় সক্রিয় অংশ নিচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা, স্থাপন করছে ন্যায্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

সদ্যোন্মুক্ত জাতিগুলির অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার বিলোপ হল বর্তমান কালের একটি অতি জটিল ও জরুরি সমস্যা। উন্নয়নশীল সমস্ত দেশের পক্ষেই সাধারণ সমস্যা হল অর্থনৈতিক বিকাশের গতিবেগ ত্বরণ, জাতীয় অর্থনীতির সংহতি, শিল্পায়ন, কৃষির যন্ত্রায়ন, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা দূরীকরণ। সদ্যোন্মুক্ত দেশগুলির কাছে ক্রমেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের

সহযোগিতা। সম্পর্ক পাতা হচ্ছে সমাধিকারী ও পরস্পর লাভজনক এমন সহযোগিতার ভিত্তিতে যা এইসব দেশের স্বাধীনতার সংহতি, অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যে বৈষয়িক ও টেকনিকাল সাহায্য দেয়, তা উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী। তাদের অর্থনীতির সবচেয়ে দুর্বল খাপগুলিকে মজবুত করার লক্ষ্যে চালিত হওয়ায় ভূতপূর্ব প্রভুদের ওপর তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরতাও এতে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রধানত বিকশিত হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির বনিয়াদি শাখাগুলি: শক্তি-ইঞ্জিনিয়ারিং, লৌহাদি উৎপাদন, যন্ত্রনির্মাণ, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফলে, ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলির বিকৃত অর্থনৈতিক বিশেষীকরণে আমূল পরিবর্তন ঘটছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নয়া-উপনিবেশিক পলিসির পথে প্রতিবন্ধক গড়ে উঠছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অর্থনৈতিক যোগাযোগের রূপ বিভিন্ন ধরনের। এগুলির মধ্যে পড়ে বহির্বাণিজ্য, ঋণ ও ক্রেডিট ব্যবস্থা, কর্মী প্রস্তুতি, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সংবাদ বিনিময়, শিল্পোদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বহির্বাণিজ্য বেড়ে উঠছে জাতীয় সার্বভৌমত্ব, সমাধিকার আর পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের

পাকাপোক্ত বৃদ্ধিতে সদ্যোমুত্ত রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ মেটে।
 বহির্বাণিজ্যিক লেনদেনে তারা শিল্প আর কৃষির নতুন
 উদ্যোগাদির জন্য যন্ত্রপাতি, মেশিন-টুল, সামগ্রিক
 সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি পাবার সুযোগ পায়। উন্নয়নশীল
 দেশেরা এইসব সরবরাহের দাম শোধ করে তাদের
 চিরাচরিত রপ্তানি — কফি, কোকো, বাদাম, মশলা,
 ফলমূল পাঠিয়ে। তাছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে
 সোভিয়েত ইউনিয়ন কেনে বস্ত্র, কুটির শিল্প ও
 কারুশিল্পের দ্রব্যাদি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঠানো
 মালে এসব দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর শাখাগত
 পরিবর্তন ঘটছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল
 দেশ থেকে শিল্পদ্রব্যেরও রপ্তানি বাড়ছে। ১৯৬৬
 সালেই সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নয়নশীল দেশগুলি
 থেকে পাঠানো তৈরি শিল্পদ্রব্যের ওপর শুল্ক তুলে
 দেওয়া হয়। পুঞ্জিতান্ত্রিক বাজারে তাদের যে কঠোর
 প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয়, তাতে এ ব্যবস্থার
 তাৎপর্য তাদের পক্ষে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বের বাজারে কাঁচামালের যে দাম তার অস্থিরতায়
 বেশ ক্ষতি হয় নবীন রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতির। পুঞ্জি-
 তান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির
 রপ্তানির মধ্যে কাঁচামালের ভাগ ৮০ শতাংশ পর্যন্ত।
 কিন্তু তার দাম স্থির করে দেয় আন্তর্জাতিক একচেটিয়া।
 সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চলে পরিকল্পিত
 সুস্থির দামের ভিত্তিতে, স্বতঃস্ফূর্ত ওঠা-পড়া থেকে
 তা মুক্ত। এতে এইসব দেশের পক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক

বিকাশের স্বার্থে পাকা ভিত্তির ওপর বহির্বাণিজ্যিক
বিনিময়ের কর্মসূচি রচনা সম্ভব হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক
দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগাযোগের বিকাশে নবীন
রাষ্ট্রগুলির বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি ত্বরান্বিত
হয়। আন্তঃসরকারি চুক্তির ভিত্তিতে সোভিয়েত
ইউনিয়ন উন্নয়নশীল দেশগুলির শিল্পায়নে কার্যকরী
অংশ নেয়, সাহায্য করে বহুশাখ জাতীয় অর্থনৈতিক
কমপ্লেক্স গঠনে, যাতে নিশ্চিত হয় তাদের অর্থনৈতিক
স্বাবলম্বন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় একসারি
সদ্যোন্মুক্ত দেশে নির্মিত হয়েছে প্রায় ৭০০টি উদ্যোগ,
আরো ৫০০টির নির্মাণ চলছে। তার মধ্যে পড়ে
বিদ্যুৎকেন্দ্র, বাঁধ, লৌহাদি কারখানা, গ্যাস ও তৈল
পাইপলাইন ইত্যাদি। অধিকাংশ নির্মাণ জাতীয়
অর্থনীতির চারিকার্ঠি উদ্যোগ নিয়ে। ফলে জাতীয়
অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধান হয় তাতে
অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল মানে। যেমন,
ভারতে বিশাখাপত্তনমে যে কারখানা এখন নির্মিত
হচ্ছে, তার উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৩০ লক্ষ টন ইস্পাত।
সম্প্রসারিত হচ্ছে ভিলাই আর বোকারোর পূর্বনির্মিত
উদ্যোগ। তারা হয়ে দাঁড়াবে বার্ষিক ৫০ ও ৫৫ লক্ষ
টন উৎপাদন ক্ষমতার বিরাট লোহা-ইস্পাত কারখানা।
মুম্বই বড়ো একটা কারখানা বানানো হচ্ছে নাইজেরিয়ায়।
বছরে তা থেকে পাওয়া যাবে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন
ইস্পাত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে পাকিস্তানে

করাচির কাছে যে কারখানাটি বানানো হচ্ছে তা বছরে ইম্পাৎ দেবে ১০ লক্ষ টন।

একাধিক দেশে বড়ো বড়ো তাপ-বিদ্যুৎ সমাহার নির্মাণে সাহায্য করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। পুঞ্জিতান্ত্রিক দুনিয়া যে শক্তি সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাতে এই উদ্যোগগুলির গুরুত্ব বিপুল। নিজস্ব শক্তিভান্ডার বিকশিত করে নবীন রাষ্ট্রগুলি বাইরের বাজারে নিজেদের প্রতিযোগিতা সামর্থ্য বাড়িয়ে তুলছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সাহায্য করছে উদ্যোগাদি পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণে, নতুন টেকনোলজি প্রবর্তনে, আকরিকের সন্ধান ও নিষ্কাশনে।

মিসরে আসোয়ান ড্যাম, সিরিয়ায় ইউফ্রেটিস হাইড্রো-স্টেশনের মতো জল-ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লেক্স নির্মাণের ভিত্তিতে শুরুর হয়েছে ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা গড়ার কাজ। সেচ জমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে খাদ্যশস্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামালের ফলন বাড়বে, কৃষি উঠে যাবে উচ্চ মানে।

সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশেরা নবীন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির কৃষি উন্নয়নে বেশ অবদান যোগ করছে, ট্রাক্টর-কৃষিযন্ত্র স্টেশন, শস্যগার, মাছ কোটোবান্দ করার কারখানা ইত্যাদি স্থাপন করে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। সিরিয়া, ভারত, গিনি প্রভৃতি কতকগুলি দেশে নির্মিত বড়ো বড়ো রাষ্ট্রীয় যন্ত্রায়ত ফার্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃষি ও পশুপালনে অগ্রণী পদ্ধতি প্রচলনের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতার কল্যাণে অনেক উন্নয়নশীল দেশ শিল্পায়নের পথে বেশ এগিয়ে

গেছে। যেমন, সোভিয়েত সহায়তায় ভারতে নির্মিত উদ্যোগগুলি ভারি যন্ত্র, টার্বাইন, শক্তিশালী জেনারেটর, মেশিন-টুল, খনির সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এতে কেবল ভারতীয় রপ্তানির কাঠামোই নয়, সমগ্রভাবে যেমন শিল্পোন্নত তেমনি উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে তার বহিঃর্থনৈতিক যোগাযোগের চরিত্রও বদলে যাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সহায়তায় নির্মিত সমস্ত উদ্যোগই হয়ে দাঁড়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলির রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। এসব দেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় সেক্টরের শক্তিবৃদ্ধি তাদের সাধারণ জাতীয় স্বার্থেরই পোষক। পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক কাঠামোর জায়গায় গড়ে ওঠে বনিয়াদি ধরনের সব শাখা। রাষ্ট্রীয় সেক্টরের ফলে সম্ভব হয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাস্তব নিয়ন্ত্রণ, বাজারের স্বতঃস্ফূর্ত দোলায়মানতা সীমাবদ্ধ করা যায়। উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রীয় সেক্টর হল সামাজিক, গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ভিত্তি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ আর উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক হল একটা নতুন ধরনের সত্যকার সমাধিকারী ও গণতান্ত্রিক সম্পর্ক। বিশ্ব সমাজতন্ত্র আর জাতীয় মর্দুত্তি আন্দোলনের মধ্যে জোটের মজবুতীতে সমগ্রভাবেই সামাজিক অগ্রগতিতে সাহায্য হয়। মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ ও পীড়ন যেখানেই চলুক না কেন, তা নিমূর্ল করায়, উপনিবেশবাদের, নয়-উপনিবেশবাদ

আর বর্ণবাদের সমস্ত আত্মপ্রকাশকে নিশ্চিত করায়
গোটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া একান্ত আগ্রহী।

সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসারে এবং নিজেদের ঐতিহাসিক
অভিজ্ঞতা থেকে সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশেরা
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য উন্নয়নশীল
দেশগুলির ন্যায্য আকাঙ্ক্ষার সমর্থক। তাদের সঙ্গে
সমাধিকারী, পরস্পর লাভজনক সহযোগিতার,
অর্থনৈতিক সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী পলিসি প্রসূত
বৈষম্য দূরীকরণের পক্ষপাতী তারা। একবাক্যে তারা
সমর্থন করে ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ
পরিষদে গৃহীত কতকগুলি দলিল, যেমন, 'নতুন
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে ঘোষণা',
'রাষ্ট্রগুলির অধিকার ও কর্তব্যের সনদ' ইত্যাদি।
এইসব দলিলে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পর্কের যুক্তিযুক্ত
পুনর্গঠনের পথ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের
যে সহযোগিতা তার প্রভাব পড়ে বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক
অর্থনীতিতে তাদের অবস্থার ওপর। প্রথমত, সদ্যোমুদ্রিত
দেশগুলির শিল্প বিকাশের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম
বিভাগে তাদের অবস্থার অসমতা দূরীকরণে সাহায্য
হয়। দ্বিতীয়ত, স্থাপিত হয় অর্থনৈতিক যোগাযোগের
বেশি অনুকূল পরিস্থিতি। উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে
লেনদেনে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ধরনের সুবিধাজনক
শর্ত দেয়, তার চাপে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরও মূঠো
আলগা করতে বাধ্য হয়।

নবীন রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে

প্রভূত তাৎপর্য ধরে ক্রেডিট পলিসি। সমাজতান্ত্রিক দেশেরা যে ঋণ ও ক্রেডিট দেয়, তা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের থেকে আমূল পৃথক। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন অর্জন এবং নিজেরাই নিজেদের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ভবিষ্যৎ পথ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিঃস্বার্থে সাহায্য করে সৌভিয়েত ইউনিয়ন তথা সমগ্র সমাজতান্ত্রিক শিবির।

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি নবীন রাষ্ট্রদের যে 'সাহায্য' দেয়, সেটাকে তারা চেষ্টা করে নিজেরা ধনশালী হবার উৎসে পরিণত করতে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আর পুনর্গঠন ও বিকাশের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের মতো সংগঠনগুলি ঋণ দেয় চড়া সুদে, বছরে ৬% হারে। সমাজতান্ত্রিক দেশরা ক্রেডিট দেয় অনেক কম সুদে, ২-৫% হারে, পরিশোধের জন্য ১০-১২ এমনিকি আরো বেশি বছরের মেয়াদে। এই পলিসি পুঁজিতান্ত্রিক সুদের হার কমানোর আর পরিশোধের শর্ত বদলানোয় প্রভাব না ফেলে যায় নি।

সমাজতান্ত্রিক দেশেরা যে ক্রেডিট দেয়, তার ৭৫ শতাংশের বেশি যায় অর্থনীতির বিনিয়াদি শাখা বিকাশে। ঔপনিবেশিকতার গুরুভার দায় মোচন এতে হয় দ্রুততর। ক্রেডিট গ্রহণে স্বভাবতই উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে যে ঋণ, তা পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির নিকট অধমণীয় বাধ্যবাধকতা থেকে নীতিগতভাবে পৃথক। ক্রেডিট আর ঋণকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররা কোনোরকম রাজনৈতিক শর্তের

সঙ্গে বেঁধে রাখে না। উন্নয়নশীল দেশের স্বাধীনভাবে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পলিসি স্থির করে। কারো ওপর নিজেদের ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দেয় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমস্ত জাতির সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার তার কাছে শ্রদ্ধেয়।

সদ্যোন্মুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল সম্ভাব্য শক্তির বিকাশে প্রয়োজন হয় সুদক্ষ বিশেষজ্ঞের। ওদিকে তাদের অর্থনীতিতে বিদেশী একচেটিয়াগুলো এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে, বিদেশী বিশেষজ্ঞদেরই পছন্দ করে তারা। কেবল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতেই কাজ করে দেশীয় কর্মীরা, তবে এখানেও বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রয়োজন হয়, কেননা স্থানীয় কর্মী যথেষ্ট নেই। উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগাদি যত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সুদক্ষ জাতীয় কর্মীর প্রস্তুতি তার সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারছে না।

নবীন রাষ্ট্রগুলিতে গড়ে উঠছে বিভিন্ন পেশার বিশেষজ্ঞ গড়ার জাতীয় ব্যবস্থা, বিপুল সংখ্যক তরুণ সেখানে পড়াশুনা করছে। এরূপ সমস্ত দেশে মোট উচ্চশিক্ষার্থী ৯৩ লক্ষ, ভারতে ৩৫, ব্রাজিলে ১৫ লক্ষ। বিশেষজ্ঞ প্রস্তুতি চিরাচরিত ধারায় চলে উন্নত পুর্নজিভান্ত্রিক দেশগুলিতে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা সেখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের পরিণত করতে চায় নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পলিসির বাহকে।

জাতীয় কর্মী গঠনে ফলপ্রসূ সাহায্য দেয় সমাজতান্ত্রিক দেশেরা। নিজেদের কোনো স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্য

না নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক প্রবণতার উন্নয়নশীল দেশগুলির কর্মী প্রস্তুতিতে অংশ নিচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া: যেমন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতি বছর তৈরি হয়ে বেরয় প্রায় ৮০ হাজার বিশেষজ্ঞ — ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক, কৃষিবিজ্ঞানী, টেকনিশিয়ান, সুদক্ষ শ্রমিক। উদ্যোগাদি নির্মাণ ও চালু করার যে প্রক্রিয়া, তার মধ্যেই শ্রমিকদের শিখিয়ে তোলার রিগেডাভিস্তিক ও ব্যাভিভিস্তিক ব্যবস্থা আর কোর্স চালু করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই ধরনের তালিমের মধ্যে দিয়ে গেছে সুদক্ষ শ্রমিকদের অর্ধেকেরও বেশি। সোভিয়েত উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিতে প্রতি বছর শিক্ষা নেয় নবীন রাষ্ট্রগুলির ১৫ সহস্রাধিক করে বিদ্যার্থী। কেবল মস্কোর লুমুম্বা মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়েই ৮৯টি উন্নয়নশীল দেশের ছাত্ররা শিক্ষা নিচ্ছে। সোভিয়েত উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিতে বছরে বছরেই বেড়ে যাচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ছাত্রসংখ্যা। খোদ উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা ও প্রস্তুতির জাতীয় ব্যবস্থা গড়ায় সহায়তা করছে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা। ২৬টি দেশে সাফল্যের সঙ্গে কাজ চালাচ্ছে ১৪৩টি উচ্চ শিক্ষায়তন ও টেকনিকাল স্কুল, আরো গড়া হচ্ছে ৮৮টি। সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণে উচ্চ শিক্ষায়তন ও টেকনিকাল স্কুল গড়া হয়েছে ভারত, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান ও আরো কয়েকটি এশীয় দেশে। কাজ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় স্থাপিত গিনির পলিটেকনিকাল ইনস্টিটিউট, টিউনিসিয়ায় জাতীয় টেকনিকাল

ইনস্টিটিউট, আলজেরিয়ায় তৈল ও গ্যাস ইনস্টিটিউট, মালিতে উচ্চ প্রশাসনিক বিদ্যালয় প্রভৃতি। এইসব দেশে নির্মিত উচ্চ শিক্ষায়তন ও টেকনিকাল বিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে প্রায় ২০ হাজার ইঞ্জিনিয়ার আর টেকনিশিয়ান। এই এবং অন্যান্য শিক্ষায়তনে কাজ করেন ১৭০০-এর বেশি সোভিয়েত অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ। এইভাবে সোভিয়েত উচ্চ শিক্ষায়তনগুলির অভিজ্ঞতা আসছে নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির আয়ত্তেও এবং তার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে জাতীয় কর্মী প্রস্তুতির এমন ব্যবস্থা যাতে আধুনিক দাবি মেটে।

এইসব রাষ্ট্রকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহায্য করে দক্ষ কর্মীর চাহিদার সঙ্গে তাদের প্রস্তুতির কর্মসূচি মেলাতে। উদ্দেশ্যমূলক বিশেষজ্ঞ প্রস্তুতির ফলে শ্রম বাজারের স্বতঃস্ফূর্ত অনিশ্চিতি অনেকটা হ্রাস পায়, সাহায্য হয় এই দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শক্তিশালী করায়।

বিকশিত হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর সদ্যোন্নত দেশগুলির মধ্যে নতুন রূপের অর্থনৈতিক সম্পর্ক যা বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের পরিস্থিতিতে উৎপাদনী শক্তির গঠনে গুরুগত পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন শাখায় উৎপাদনী সমবায়ের মতো পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে, ঘটছে দ্রব্যের বিনিময় থেকে সেগুলির একত্রে উৎপাদনে উৎক্রমণ। এমন সমবায় কাজ করছে সোভিয়েত ও ভারতীয় পক্ষ মিলে, যা একাধিক দেশের পক্ষ থেকে ধাতু কারখানার ভারি সাজসরঞ্জামের বড়ো বড়ো ফরমাশ পূরণ করছে।

সহযোগিতার বিকাশে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সোভিয়েত বহির্বাণিজ্যিক সংগঠনগুলির অংশগ্রহণে বাণিজ্যিক, অংশিদারি ও অন্যান্য কোম্পানি গড়া উপযোগী হয়ে উঠছে। আপাতত কাজ করছে কেবল দুটি সোভিয়েত-সিঙ্গাপুর কোম্পানি, কিন্তু ভবিষ্যদ্বাৰ্ভ এইরূপ সহযোগিতা অন্যান্য দেশেও সম্ভবপর।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশেদের সহযোগিতা কেবল আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়েই রূপায়িত হচ্ছে না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিরা, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব সংগঠনাদি এইসব দেশের রাজনৈতিক পার্টি ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখে। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতিতে চালিতে সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণ ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলির বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক শক্তির সাহায্য করে নানাভাবে।

৪। সমাজতন্ত্র এবং বর্তমান কালের ভূমণ্ডলীয় সমস্যা

ইদানীং বিশেষ তীব্র হয়ে উঠেছে এমন কতকগুলি সমস্যা যা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জীবপরিবেশঘটিত সমস্যার এমন একটা জটিল সমষ্টি যার চরিত্র গ্রহব্যাপী, তাই তাদের বলা হয় বর্তমানের গ্লোবাল বা ভূমণ্ডলীয় সমস্যা। তার মধ্যে পড়ে যুদ্ধ আর শান্তির সমস্যা, উন্নয়নশীল দেশগুলির পশ্চাৎপদতা বিলোপ, শক্তি, কাঁচামাল, জীবপরিবেশের সমস্যা। সমস্ত দেশের,

সমাজের সমস্ত স্তরের স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত, পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল তাতে স্পৃষ্ট, তাই তার চরিত্র বিশ্বজনীন। সেগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও জনগণের মিলিত প্রয়াস।

অতুল্যত উৎপাদনী শক্তির সমাজে মানুষ, তৎসৃষ্ট প্রযুক্তি আর পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির মধ্যে বহু জটিল সংঘাত ও বিরোধ দেখা দেয় যার পরিণাম খারাপ। এই বিরোধ থেকেই আসে প্রকৃতির ক্ষেত্রে ভূমন্ডলীয় সমস্যা।

এ সমস্যা উদ্ভবের অন্য উৎস হল সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থা।

উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের ব্যবস্থা চালু করে, তাও কম তীব্র বিরোধের জন্ম দেয় না। এই বিরোধগুলি থেকে দেখা দেয় উন্নয়নশীল দেশগুলির পশ্চাৎপদতা দূরীকরণ, বদভুক্ষা আর বিশ্ব পারমাণবিক যুদ্ধের যে বিপদ তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতো গ্রহব্যাপী সমস্যা।

তবে বর্তমান কালে মানবজাতির সমস্ত সমস্যাতেই অন্তর্ভুক্ত হয় সামাজিক সম্পর্কের প্রভাব, কেননা ভূমন্ডলীয় সমস্যার সমাধান নির্ভর করে সামাজিক ব্যবস্থার ওপর।

ভূমন্ডলীয় সমস্যাকে তিনটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করা যায়।

১। সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত 'আন্তর্জাতিক সামাজিক সমস্যা'। এগুলি উৎপাদনের

বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ধরনের মধ্যে সহযোগিতা বা সংগ্রামের প্রশ্ন নিয়ে। যেমন, যুদ্ধ আর শান্তি, সদ্যোমুক্ত দেশগুলির জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমাধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্যা।

২। ‘মানুষ-সমাজ’ সমস্যা, যার মধ্যে পড়ে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি, শিক্ষা, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি। এগুলিও সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেই সঙ্গে খোদ মানুষকেই প্রধান উৎপাদনী শক্তি হিসেবে তার বিকাশকে তা স্পর্শ করে।

৩। ‘মানুষ-প্রকৃতি’ সমস্যা, যা পরিবেশ রক্ষার প্রশ্ন, শক্তি, কাঁচামাল, খাদ্য উৎপাদনের সমস্যাঘটিত। সামাজিক ব্যাপার এক্ষেত্রে প্রভাবিত করে কেবল সমস্যা সমাধানের চরিত্র আর পথকে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ এই তিন গ্রুপের সমস্যার সঙ্গেই পরিচিত। শুধু তাই নয়, প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপের সমস্যা ঐ সমাজই সৃষ্টি করছে অবিরাম ও বিপুল আয়তনে। সর্বোচ্চ মুনাবা পাবার জন্য পুঁজিপতিদের প্রয়াস থেকে তা ঘটছে অবজেকটিভ ধারায়। তৃতীয় গ্রুপের সমস্যাগুলিকে তীব্র ও সুদৃগভীর করে পুঁজির প্রভুত্ব, তাদের চরিত্রকে করে তোলে বৈরমূলক। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল জ্ঞানে সমৃদ্ধ হলেও, প্রকৃতির নতুন নতুন রহস্য উন্মোচন করলেও সে প্রকৃতিকে রক্ষা করায়, তার বিকাশে ভারসাম্য রাখায় পুঁজিতন্ত্রের গরজ নেই।

এইভাবে ভূমণ্ডলীয় সমস্যাগুলিতে প্রতিফলিত হচ্ছে বিজ্ঞান, টেকনিকের উদ্দাম বিকাশ আর পুঁজিতন্ত্রের

সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে বৈর-বিরোধ। সাম্প্রতিক পুঁজিতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সামর্থ্য কতকগুলি ভূমণ্ডলীয় সমস্যার সমাধান যদি-বা সম্ভব হয়, সামাজিক সম্পর্ক সেক্ষেত্রে সে সম্ভাবনাকে নাকচ করে।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন হল বর্তমান কালের সবচেয়ে জরুরি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শান্তি রক্ষা, পারমাণবিক বিশ্ব বিপর্যয় নিবারণের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সবকিছু করে যাচ্ছে।

সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্র সদৃশত শান্তিপূর্ণ বহির্নীতি অনুসরণ করে। ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পরই সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম দলিলই ছিল শান্তির ডিক্রি। নবীন প্রজাতন্ত্রটির সরকার সমস্ত দেশের সরকারকে আহ্বান করে জাতিগুলির মধ্যে পাকাপোক্ত, ন্যায্য শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, ঘোষণা করে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, মর্তুতি ও স্বাধীনতা প্রয়াসী সমস্ত জনগোষ্ঠীকে সমর্থন জানায়। সেই থেকে সোভিয়েত বৈদেশিক পলিসি এইসব নীতির প্রতি বিশ্বস্ত।

বর্তমানে যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা বিশেষ তীব্র হয়ে উঠেছে। অস্ত্রবলে নিজের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদ অস্ত্র প্রতিযোগিতা উশকিয়ে তুলছে এই প্রথম নয়। নতুন যুদ্ধের আয়োজনে সাম্রাজ্যবাদ কাজে লাগাচ্ছে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের সমস্ত সৃষ্টি। জাতিসঙ্ঘের তথ্য অনুসারে বিশ্বে নিউক্লিয়ার অস্ত্রসম্ভারের মোট শক্তি সাধারণ বিস্ফোরক

দ্রব্যের ৫০০০ কোটি টন ছাড়িয়ে গেছে। এই অস্ত্র
পৃথিবীর জীবন্ত সবকিছুকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায়
১৫ বার। সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে সত্যসত্যই গ্রহব্যাপী।
যুদ্ধের যে হাতিয়ারে পারমাণবিক প্রলয় ঘটতে পারে
তার বৃদ্ধিতে বিশ্বের জনসমাজ উৎকণ্ঠিত।

ন্যাটো সামরিক রকের অন্তর্ভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী
রাষ্ট্রগুলির পলিসি আন্তর্জাতিক প্রশ্নের মীমাংসায়
সামরিক শক্তি অবলম্বনে সচেষ্ট। পূর্জির আধিপত্য
টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের শাসক মহলের রাজনৈতিক
ভীতি প্রদর্শন, ভাবাদর্শীয় অন্তর্ঘাত এবং সোজাসৃজি
পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি কাজে লাগায়।
আগ্রাসী পলিসির ঔচিত্য দেখাবার জন্য বৃজ্জোয়া
ভাবাদর্শীরা ‘সোভিয়েত পক্ষ থেকে যুদ্ধের আশংকা’,
‘সোভিয়েত সামরিক শ্রেষ্ঠতা’ প্রভৃতি কল্পকথার প্রচার
করে। এইসব অজুহাত দিয়ে সমরশিল্প মহল সামরিক
খাতে ব্যয়বৃদ্ধি আদায় করে নেয়, গড়ে তোলে অস্ত্রের
নতুন ব্যবস্থা।

আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্বের জনগণ
নির্ভর করে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গতিপরায়ণ শান্তিকামী
বহির্নীতির ওপর। সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা প্রবল হচ্ছে তাদের সামাজিক-
অর্থনৈতিক বিকাশের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে। সোভিয়েত
ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ সর্বদা অস্ত্র
প্রতিযোগিতায় ক্ষান্তির, উত্তেজনা প্রশমনের দাবি করেছে
ও করছে। বিস্তৃত শান্তি কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছে

সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমস্ত শান্তিকামী শক্তি তা সমর্থন করেছে। ৮০'র দশকের জন্য শান্তি কর্মসূচি আরো বিকশিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিদের গৃহীত একসারি দলিলে, তথা ১৯৮৫ সালে ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির রাজনৈতিক পরামর্শ কমিটির ওয়ারশ অধিবেশনে গৃহীত রাজনৈতিক ঘোষণায়।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সমাধিকার ও একই প্রকার নিরাপত্তা — এই প্রধান নীতি থেকে এগোয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ওয়ারশ চুক্তির অন্যান্য দেশের প্রস্তাবগুলি রচিত সামরিক বিরুদ্ধতার মাত্রা হ্রাস, সুতরাং পারমাণবিক বিপর্যয়ের বিপদ কমানোর লক্ষ্যে। শান্তি কর্মসূচির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় বিরতি এবং সার্বিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণে উত্তরণের প্রস্তাব।

এ গ্রহে শান্তির জন্য সমাজতন্ত্রের যে সংগ্রাম, তাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে জোট-বহির্ভূত আন্দোলন আর সমস্ত দেশের শান্তিকামী শক্তিদের প্রবল যুদ্ধবিরোধী অভিযান। ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে তা পরিব্যাপ্ত, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামত ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কোটি কোটি লোক আর শান্তি যোদ্ধাদের শত শত নানান সংগঠন আছে তাতে। পৃথিবীর সমস্ত জাতি সর্বকালে যুদ্ধকে দেখেছে এক ভয়াবহ সর্বনাশ বলে যা নিয়ে আসে দঃখ, কষ্ট, ধ্বংস আর মৃত্যু। তাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তি উদ্যোগকে তারা সাগ্রহে সমর্থন করে।

শিল্প, কৃষি, সংস্কৃতি বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি

সৃষ্টি সর্বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেসব দেশের কাছে যারা ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে চেষ্টা করছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাদের নিজেদের প্রভাব ক্ষেত্রের মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করে, এসব দেশের কাঁচামাল আর শ্রমসম্পদ চালান দিয়ে প্রচুর মুনাফা লোটে। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক, টেকনিকাল আর সামরিক 'সাহায্য' দিয়ে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয় নিজেদের ভাবাদর্শ।

নিজেদের সামাজিক-অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সদ্যোমুক্ত জাতিদের সর্বোপায়ে সাহায্য করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। এসব জাতির সামনে এমন দেশ আছে যাদের কাছ থেকে শেখা যায়। প্রথমে একটি দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে জয়লাভ করে সমাজতন্ত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেদের সামাজিক-অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা দূর করে। পুঁজিতান্ত্রিক অতীত থেকে পাওয়া সুকঠিন সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানে সাহায্য করেছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আগে যেসব জাতি ছিল পশ্চাৎপদ, নিপীড়িত, আজ তারা সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমাধিকারী বহুজাতির ইউনিয়নভুক্ত, আছে তাদের উচ্চ মানের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান।

সদ্যোমুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির যা সম্পর্ক, সেটা প্রতিষ্ঠিত সত্যকার সমাধিকার আর পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর। এতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য হয় তাদের, স্বাধীনভাবে তারা স্থির করতে পারে ভবিষ্যৎ সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের

পথ। সমাজতন্ত্র একটা শোষণহীন, পীড়নহীন সমাজ, বহু উন্নয়নশীল দেশের জনগণের সহানুভূতি যায় সেদিকে, তাদের অনেকে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ নিয়েছে।

সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক মালিকানা আর বিকাশের পরিকল্পিত চরিত্রের ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক আর বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিকাশে স্বতঃস্ফূর্তি আর নিয়ন্ত্রণহীনতা পরিহার করা যায়। মানুষের অবাধ, সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। সেটা নিশ্চিত করার জন্য মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হচ্ছে যেসব ভূমণ্ডলীয় সমস্যায়, তাদের সমাধান প্রয়োজন।

তার একটা হল মানবজাতির খাদ্য সংস্থান। বর্তমানে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মানুষ ক্ষুধাক্লিষ্ট। তাদের প্রধান অংশটা থাকে এশিয়া ও আফ্রিকায়। ক্ষুধার তাড়নায়, অপদুষ্টিকর খাদ্যে যা আরো বেড়ে ওঠে, প্রতি বছর মারা যায় ৩-৪ কোটি লোক। উন্নত পুষ্টিজাতান্ত্রিক আর উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে খাদ্য গ্রহণের মানে যা পার্থক্য, সেটা বেড়ে উঠছে। তাই বর্তমান দুনিয়ায় অত্যন্ত তীব্র একটা সমস্যা হল খাদ্য সমস্যা।

এ সমস্যাটা একদিকে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থা এবং অন্যদিকে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় লোকেদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত।

স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থা নির্ধারিত হয় চাষের উপযোগী ভূমির পরিমাণ; কৃষি উৎপাদনের প্রখরতার মাত্রা, বন্য, সার, শস্যরক্ষণী রাসায়নিক উপায় প্রয়োগ

ইত্যাদি; জলসম্পদের অস্তিত্ব; পরিবেশের অবস্থা, বিশেষ করে জলবায়ুর পরিস্থিতি; শক্তিসম্পদের ব্যবহার দিয়ে। কিন্তু এই সব শর্তেরই সামাজিক দিকও আছে।

পর্দাজাতান্ত্রিক দেশে ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বিশ্বে চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং ক্রমশই তা কমছে। খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য চাষযোগ্য জমির যে বৃদ্ধিটা প্রয়োজন, তার ভাগ্য নির্ধারিত হয় একমাত্র মালিকদের স্বার্থে। কৃষি উৎপাদনের প্রত্নরীকরণ ঘটে মজদুরি শ্রম শোষণ বাড়িয়ে। আর শক্তিসম্পদে বৃদ্ধির পরিণাম দাঁড়ায় কৃষিদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। মালিক শ্রেণী যে খরচা করে তার ক্ষতিপূরণ হয় দাম বাড়িয়ে, অর্থাৎ পরিভোগীদের ঘাড় ভেঙে। এসবের ফলে বিশ্বে খাদ্য সমস্যার সমাধানে সাহায্য হয় না।

খাদ্য সমস্যাকে সাম্রাজ্যবাদী দেশেরা কাজে লাগায় নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে। যেমন, খাদ্য 'সাহায্য' হিসেবে তারা শস্য পাঠায় কেবল সেইসব দেশে যেগুলি তাদের কাছে স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব ধরে। এতে সমস্যাটার সমাধান হয় না, কেবল খানিকটা মূলতবি রাখা হয়, পরে আরো প্রচণ্ড হয়ে তা ফেটে পড়ে। আর এরকম 'সাহায্যের' দাম খুবই চড়া — সাম্রাজ্যবাদের কাছে অর্থনৈতিক এবং মাঝে মাঝে রাজনৈতিক পরাধীনতার থেকে যেতে হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতায় সন্দেহ থাকে না যে খাদ্য সমস্যার আমূল সমাধান সম্ভব কেবল সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের বিজয়ে। সমাজতান্ত্রিক

বিশ্ব ব্যবস্থা খাদ্য সমস্যার সমাধান করে তাদের প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে এবং সমগ্রভাবে গোটা ব্যবস্থাটা নিয়ে। ১৯৭৮ সালে সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশেরা কৃষির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়েছে, যাতে অর্থনীতির এই শাখাটাকে আধুনিক শিল্পের ভিত্তিতে বিকশিত করার কথা আছে। খাদ্য শিল্পের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতির উৎপাদনে শ্রম বিভাগ প্রবর্তিত হয়েছে। কৃষি ও পশুপালনের ক্ষেত্রে আগুয়ান টেকনোলজির বিনিময় চলছে। বিকশিত হচ্ছে উচ্চফসলি জাতের শস্য ফলানো এবং চালু করায় সহযোগিতা। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভূতি সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণের সচ্ছলতা নিশ্চিত করার কর্তব্য নিয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যে খাদ্য কর্মসূচি কার্যকৃত হচ্ছে সেটা হল সামনের পর্বে পার্টির অর্থনৈতিক রণনীতির একটা মূলঙ্গ। ১৯৯০ সাল অবধি গোটা সময়টা নিয়ে কর্মসূচিতে কৃষির উৎপাদনী ক্ষমতার আরো বৃদ্ধি এবং কৃষি-শিল্প কমপ্লেক্সগঠনের কথা আছে। কৃষির মূল উৎপাদন ভান্ডার বাড়বে ১.৫ গুণ, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে শক্তিরাজ্য ১.৬ আর খনিজ সার ব্যবহার ১.৭ গুণ। খাদ্য কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে কৃষি-শিল্প কমপ্লেক্সের সুযম বিকাশ, কৃষি উৎপাদনের প্রচরীকরণ, ভূমির ফলপ্রসূ সদ্যবহার, বিজ্ঞান ও অগ্রণী অভিজ্ঞতার ব্যাপক প্রয়োগ, কৃষি দ্রব্যের মিতব্যয় এবং অপচয় রোধের জন্য সংগ্রাম, গ্রামীণ জীবনযাত্রার পরিস্থিতি উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে।

খাদ্য কর্মসূচি সফল করতে গিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র

প্রকৃতিরক্ষণী ব্যবস্থার কথা ভোলে না। শক্তি রক্ষা ও মৃত্তিকার অবনতি রোধের এমন সব ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে যাতে প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ভেঙে না পড়ে বরং উন্নত হয়।

এমন কর্মসূচি সম্ভব কেবল তেমন সমাজে যেখানে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত, যেখানে নেই মুনামার পেছনে ধাওয়া, আছে অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশ, যেখানে নেই মজদুর শ্রমের শোষণ, যেখানে সহযোগিতা আর সাথিসদূলভ পারস্পরিক সাহায্যের সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক কায়েম হয়েছে।

শক্তির সমস্যাটাই সম্ভবত বর্তমানের সবচেয়ে জটিল ভূমণ্ডলীর সমস্যা। প্রাকৃতিক, টেকনিকাল, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা ব্যাপারের সঙ্গে তা জড়িয়ে আছে। শক্তির সমস্যা আর কাঁচামালের সমস্যা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত।

পটুজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে এ সমস্যা খুবই তীব্র, যদিও বেশ কিছু ক্ষেত্রে এটাকে ইচ্ছে করে বাড়িয়ে তোলা হয় একচেটিয়া পটুজির স্বার্থে। পটুজির দুনিয়ায় শক্তি সংকটের প্রাদুর্ভাব ঘটে বছর দশেক আগে, প্রকাশ পায় তা আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে। এই তৈল ‘বদুম’ বা তার গরম বাজার বড়ো বড়ো, বিশেষ করে মার্কিন একচেটিয়াপতিদের কাছে খুবই লাভের ব্যাপার হয়েছিল — বিপুল মুনামা লোটে তারা।

বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক সম্পদ

নিঃশেষ হয়ে এল, এমন দুর্ভাবনার কারণ নেই। কিন্তু শক্তি ব্যয়ের গতিবেগ বেড়ে উঠছে, তাই শক্তির কাঁচামাল পাবার জন্য ক্রমেই নতুন নতুন পুঁজি লগ্নি প্রয়োজন। একচেটিয়া তার পুঁজি বিনিয়োগ করে কেবল যখন অতিমুনাফা নিশ্চিত থাকে।

শক্তির খতিয়ানে প্রধান ভূমিকা তেলের। শক্তি উৎপাদনের ৪৭% তার ভাগে। তবে ভবিষ্যতে দ্রুত বেড়ে উঠবে পারমাণবিক শক্তি, গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, বানানো হবে কৃত্রিম জ্বালানি। শক্তি সমস্যার এইরূপ সমাধান কেবল উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সাধ্যায়ত্ত: তাদের আছে। শক্তিশালী টেকনিকাল ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। সম্প্রতি যারা ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে এমন সব উন্নয়নশীল দেশের যথেষ্ট জাতীয় পুঁজি নেই (তৈলসমৃদ্ধ কয়েকটি দেশ ছাড়া)। তাদের টেকনিকাল ক্ষমতাও নেই, দক্ষ কর্মীও নেই। অথচ শক্তির চাহিদা তাদের ক্রমেই বেড়ে উঠছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে আজ পর্যন্ত তাপশক্তির উৎস হিশেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কাঠ। শক্তির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে শক্তির সমস্ত ধরনের কাঁচামালেরও দাম।

এইভাবে শক্তি ও কাঁচামাল সমস্যার সমাধান সামাজিক সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কেবল সমাজতান্ত্রিক নীতিতে পুনর্গঠিত সমাজই গোটা ভূগোলকের পরিসরে শক্তি ও কাঁচামাল সমস্যার সমাধানে সক্ষম।

বিশ্ব অর্থনীতিতে শক্তি ও কাঁচামালের যেমন গুরুত্ব, তেমনি উৎপাদনের পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি

দ্রুত অবস্থানে। ১৯৮৫ সালে বিশ্বের উৎপাদনে তাদের
 ভাগ — বিদ্যুৎশক্তি — ২১.৩, কয়লা — ২৬.২,
 তেল — ২০.৭, গ্যাস — ৩১.২ শতাংশ। সমাজতান্ত্রিক
 দেশগুলি তাদের জ্বালানি আর কাঁচামালের চাহিদা
 মেটায় পারস্পরিক সরবরাহের ভিত্তিতে, প্রধানত
 সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। ওরেনবুর্গ থেকে
 সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল
 গ্যাস পাইপ-লাইন চালু হয়ে গেছে ৭০-এর দশকেই।
 ভিন্নিৎসা — হাঙ্গেরীয় জনপ্রজাতন্ত্র অত্যুচ্চ ভোল্ট
 বৈদ্যুতিক লাইন সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলির একক
 শক্তি ব্যবস্থার একাংশ।

সোভিয়েত ইউনিয়নই পৃথিবীতে একমাত্র দেশ যা
 তার অর্থনৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করেছে নিজেরই
 শক্তিসম্পদ দিয়ে। এদেশে তেল, গ্যাস, কয়লা আহরণ,
 বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন বেড়ে চলতে থাকলেও জ্বালানি-
 শক্তি কাঠামোর ছকে পরিবর্তন ঘটেছে। জ্বালানি
 হিশেবে তেলের চাহিদা কমেছে, দ্রুত বেড়ে উঠছে গ্যাস,
 উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা নিষ্কাশন। ক্রমাগত ছড়াচ্ছে
 পারমাণবিক বিদ্যুৎ স্টেশন।

শক্তি ও কাঁচামালের সমস্যা সমাধানে সমাজতান্ত্রিক
 দেশেরা এইসব শাখা বিকাশের একটা সাধারণ রণনীতি
 নির্ণয় করে। শক্তির সম্পদ খরচা করা হয় খুব হিসেব
 করে, মিতব্যয়ে, যুক্তিসিদ্ধ প্রয়োগে: এমন টেকনোলজি
 প্রবর্তিত হচ্ছে যাতে শক্তি লাগবে কম। উৎপাদনের
 বিভিন্ন শাখায় পারমাণবিক বিদ্যুতের প্রয়োগ বাড়ছে।
 ছড়াচ্ছে কঠিন জ্বালানির প্রচলন। সৌর, বায়ব,

রাসায়নিক, ভূতাপঘটিত শক্তি ব্যবহার নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে। এইসব ব্যবস্থা পরিষদভুক্ত দেশগুলির দীর্ঘমেয়াদি বিশেষ কর্মসূচির অন্তর্গত।

জ্বালানি ও শক্তির রক্ষণ আর পরিবহণ প্রসঙ্গে তার যে অংশটা লোকসান যায়, তা কমানোর কর্মসূচি রচনা করেছে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা। বিশেষ মন দেওয়া হচ্ছে অর্থনৈতিক আবর্তনে প্রতিটি দেশের নিজস্ব সম্পদের সর্বাধিক নিয়োগে, সেই সঙ্গে কয়লাকে তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানিতে পরিণত করার নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে। সর্বসম্মত শক্তি পলিসির কল্যাণে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা নিজেদের সম্পদ ফলপ্রসূরূপে কাজে লাগাচ্ছে সহমিতালির স্বার্থে।

মানবজাতির ইতিহাস এগিয়ে চলেছে যেমন সমাজে লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক, অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্ক, তেমনি চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবলম্বনে।

বর্তমানে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একটা কেন্দ্রীয় ভূমণ্ডলীয় সমস্যা।

মানুষ প্রকৃতির বাইরে থাকতে পারে না। প্রকৃতির সঙ্গে নিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে মানুষের, সর্বদাই তাকে যেতে হয় প্রকৃতির প্রভাবের মধ্যে দিয়ে। সমাজ বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রীতিমতো বদলাতে থাকে। প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভরশীল এক দুর্বল জীব থেকে মানুষ পরিণত হয় প্রকৃতিকে অনেকটা নিজের অধীনে আনতে সক্ষম এক পরাক্রান্ত সত্তায়। তবে অত্যুচ্চ উৎপাদনী

শক্তির সমাজে মানুষ আর তার পরিবেশের মধ্যে এমন সম্পর্ক দেখা দেয় যার পরিণাম হতে পারে সর্বনাশ।

শিল্পোৎপাদনে টেকনিক ও টেকনোলজির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ নোংরা হতে থাকে। মালিন্যের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। শিল্প আর পরিবহণ যে বিপুল জ্বালানি পোড়ায়, তাতে অক্সিজেন হ্রাস পায়। নাইট্রোজেন আর গন্ধকের অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে মিশে ‘অম্ল পাতন’ ঘটায়, যা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। অতিবেগুনী বিকিরণ থেকে আমাদের গ্রহকে রক্ষা করে যে ওজন স্তর, সেটাকে বাঁচিয়ে রাখা গুরুতর কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেখা দিয়েছে বিশ্ব মহাসাগর নোংরা হয়ে ওঠার একটা বাস্তব বিপদ। সমুদ্র দূষণের প্রধান সূত্র হল তৈলবাহী নৌবহর।

কৃষির বিকাশ তার ফলন বৃদ্ধির জন্য, অনিষ্টকর কীটপতঙ্গ আর আগাছার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য রাসায়নিক উপায়াদি প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত। সার এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে পরিবেশ, বিশেষত জলাশয়গুলি দূষণের বিপদ দেখা দেয়। বনাঞ্চল কমে আসছে, নির্মল জল সরবরাহ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এসব ছাড়াও প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানো হচ্ছে অযৌক্তিকভাবে। হাসিল হচ্ছে তার হিতকর অংশের সামান্যই।

বোঝাই যায়, বর্তমানে প্রকৃতিকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার বিপজ্জনক পরিণাম বিলোপ ও

নিবারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। জীবপরিবেশঘটিত সমস্যার সমাধান দাবি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়াসের মিলন।

কিন্তু পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে একসারি বিরোধ দেখা দিয়েছে।

বিরোধগুলির প্রধান কারণ হল একচেটিয়া গোষ্ঠীদের আধিপত্য। প্রাকৃতিক সম্পদের উদ্দাম আহরণ অতিমন্দাফার উৎস। তাই প্রকৃতি রক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বনে একচেটিয়া আগ্রহী নয় এই কারণে যে এইসব ব্যবস্থায় প্রয়োজন অর্থব্যয়ের, প্রায়ই মোটা রকমের।

একচেটিয়া পুঁজি জীবপরিবেশ সমস্যার সমাধান করে নিজের মতো করে, তার শোষণ প্রকৃতি অনদ্বায়ী। জীবপরিবেশ সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য যে খরচা, তার সমস্তটাই সে চাপায় মেহনতিদের ঘাড়ে। পরিবেশ রক্ষায় যা ব্যয় হল, সেটা উশূল করা হয় শিল্পদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে। মূল্যবৃদ্ধির ফলে মেহনতিদের বৈষয়িক অবস্থায় অবনতি ঘটে। জীবপরিবেশ কর্মসূচির জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ও মেহনতিদের কাছ থেকে আদায় হয় কর মারফৎ।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়মাণতায় এ কথা ভাবা হয় না যে প্রকৃতি রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার। প্রাকৃতিক সম্পদ হরণ স্রেফ সরিয়ে আনা হয় অন্য দেশে, সর্বাগ্রে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার নবীন রাষ্ট্রগুলিতে। জীবপরিবেশ সংকটের পরিস্থিতিতে একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি প্রায়ই তাদের 'নোংরা' উৎপাদন চালায় অন্য মূলদুকে, প্রধানত

উন্নয়নশীল দেশে। বাইরে থেকে এটাকে দেখায় যেন উন্নয়নশীল দেশকে ‘সাহায্য’, কিন্তু আসলে সেটা নয়া-উপনিবেশবাদের একটা প্রকারভেদ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রে জীবপরিবেশ সমস্যা সর্বিশেষ তীব্র হয়ে উঠেছে। তাই প্রকৃতি রক্ষার পেছনে মোটা খরচ এড়িয়ে জাপানি উদ্যোক্তারা পিণ্ডেৎপাদনের ‘কাওয়াসাকি স্টিল’ সরিয়ে নিয়ে গেছে ফিলিপাইনে। আর্সেনিক উৎপাদনের একটি মার্কিন ফার্ম তাদের কারখানা নিয়ে গেছে মেক্সিকোয়। মার্কিন কর্পোরেশনগুলো তাদের তৈলশোধনাগার বানাচ্ছে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশগুলিতে। কিন্তু সেখানে শোধিত হচ্ছে স্থানীয় নয়, ভেনেজুয়েলা আর আরব দেশগুলির তেল, কেননা তাতে গন্ধক বেশি। স্থানীয় যে তেলে গন্ধক কম, তার প্রসেসিং হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। চড়া মুনায়ফার তাগিদে হটে যাচ্ছে জীবপরিবেশ রক্ষার প্রয়োজন।

তাই রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুর্নজিতন্ত্র মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে অক্ষম। জীবপরিবেশ সমস্যার সমাধান সম্ভব কেবল উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার শর্তে।

লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম সোভিয়েত সরকারের ক্রিয়াকলাপ থেকেই প্রকৃতি রক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। ভূমি, বন, ভূগর্ভ, সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সমাজতন্ত্রে জনগণের সম্পত্তি। সোভিয়েত রাজের ডিক্রি ও নির্দেশগুলির লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন শাখায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পদ্ধতিকে

উন্নত করা। সামাজিক-অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে থাকে সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি।

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে জীবপরিবেশে পরিবর্তন ঘটছে আগের চেয়ে বেশি দ্রুত। পরিবর্তিত হচ্ছে জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র, লিঙ্গিত হচ্ছে জল ও শক্তি ব্যয়ের সুষম অনুপাত। বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবে প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার। কাঁচামাল আহরণের বর্তমান হারে খেয়ে যাচ্ছে তার সঞ্চার। প্রথম উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপে নোংরা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর প্রকৃতি নিজে নিজে আধুনিক উৎপাদনের ক্ষতিকর ফলাফল শুধরে নিতে পারে না। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে বেশি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ জীবপরিবেশঘটিত সমস্যাদির সমাধান করে নানা উপায়ে। বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি ও প্রকৃতি ব্যবহারের দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঁচসালী পরিকল্পনাগুলিতে এমন ব্যবস্থা থাকে, যার লক্ষ্য জীবপরিবেশ সমস্যার সমাধান। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পিত চালনায় কেবল প্রকৃতি ব্যবহারের নৈতিবাচক ফলাফল দূর করার ব্যবস্থাই থাকে না, তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, প্রকৃতিকে রক্ষা করার ব্যবস্থাই নেওয়া হয়।

এর জন্য জাতীয় অর্থনীতির শাখাগত বিন্যাসকে সূচু করে তোলা হচ্ছে। প্রবর্তিত হচ্ছে ‘আত্মবদ্ধ’

উৎপাদনী পদ্ধতি, যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের মিতব্যয় হয় এবং তা ব্যবহারের মাত্রা বাড়ে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রাকৃতিক কাঁচামালের যেমন আহরণ, তেমনি তার সদ্যবহারেরও পরিকল্পনা ছকে, কারখানার ফেলানিকে কাজে লাগাবার জন্য সযত্ন থাকে। আহরণমূলক উদ্যোগগুলি যে আকরাণ্ডল পায়, তার যুদ্ধান্ত্রিযুদ্ধ উপযোগের জন্য দায়ী থাকে তারা।

সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে উৎপাদনী উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানায় গোটা সমাজের আর প্রতিটি লোকের স্বার্থ সংযোজিত হয়। অস্তিত্বের স্বাভাবিক পরিস্থিতির রক্ষণ আর আধুনিক সভ্যতার বিকাশে সমাজতন্ত্র আগ্রহী। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তি নীতি, পরিবেশ রক্ষা আর মানবজাতিকে ক্ষুধা থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের প্রয়াস তার সাক্ষ্য। কিন্তু নিজেদের ভূখণ্ডে জীবপরিবেশ সমস্যার সমাধানে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা যত সাফল্যই লাভ করুক, এমন সমস্যাও রয়ে যায় যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন গোটা গ্রহের সমস্ত জাতির একত্র উদ্যোগ।

মার্কস তৎকালে বলেছিলেন যে মানুষ আর মানুষ, মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে সমস্ত বিরোধের সমাধান সম্ভব কেবল কমিউনিজমেই। আজ বাস্তব সমাজতন্ত্রের কর্মকাণ্ডে সমর্থিত হচ্ছে এ কথাটা। তাই বর্তমান কালের ভূমণ্ডলীয় সমস্যার তীব্রতা, তা সমাধানের আবশ্যিকতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সপক্ষে একটা প্রত্যয়জনক যুক্তি আর তার মানে — আবশ্যিক সমগ্র মানবজাতির সামাজিক যুক্তি।

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজতন্ত্র ও শান্তির জয়যাত্রা

আমাদের এই সুবিশাল যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল মানবজাতির প্রগতিশীল বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয়ের প্রশ্ন। তার সমাধানে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বিষয়ে মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদ এবং তার ব্যবহারিক রূপায়ণ — বাস্তব সমাজতন্ত্রের অবদান বিপুল। বর্তমান যুগের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়ে উঠছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক অস্ত্রাগার। ইতিমধ্যেই ৭০ বছরের অভিজ্ঞতা জমেছে বাস্তব সমাজতন্ত্রের, মানুষের জীবনের পক্ষে সময়টা কম নয়।

বাস্তব সমাজতন্ত্রের সাফল্যের কারণ উৎপাদনের উপায়ের ওপর সমাজতান্ত্রিক, সামাজিক মালিকানার আধিপত্য, সেটাই হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি।

সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রামে মেহনতিদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ হল

উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার প্রশ্নটা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এ মালিকানা সামাজিক হওয়ায় নিশ্চিত হয়েছে অর্থনীতির বিকাশে শ্রেষ্ঠত্ব, উৎপাদনের দ্রুত, পাকাপোক্ত বৃদ্ধি, জনগণের সচ্ছলতা ও সাংস্কৃতিক মানের অবিরাম উন্নয়ন।

তাই সমাজতন্ত্রের ধারণাকে হেয় করার প্রয়াসে বুদ্ধিজীবীরা ভাবুকদের সর্বাপেক্ষে উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার মর্মার্থটাকেই বিকৃত করার চেষ্টা করে।

উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ এবং মেহনতিদের নিকট তা হস্তান্তরের প্রগতিশীল তাৎপর্য তারা অস্বীকার করে। তাদের মতে, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় দেশের অর্থনীতিতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয় না। সামাজিক মালিকানা বলতে তারা বোঝে সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে যেকোনো রাষ্ট্রের মালিকানা। তারা মনে করে, এই ধরনের সামাজিক মালিকানা থেকে আপনা আপনি আসে সমাজতন্ত্র। সুতরাং রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঞ্জিতন্ত্রেও নাকি সমাজতন্ত্রের আদল প্রকাশ পাচ্ছে।

সংস্কারবাদীরা দেখাবার চেষ্টা করে যে সমাজতন্ত্রে মালিকানার চরিত্রটা নিছক রাজনৈতিক। মালিক হিশেবে রাষ্ট্রকে তারা দাঁড় করায় গোটা সমাজের বিপরীতে। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষণ তাদের কাছে এমন মাত্রার কেন্দ্রিকতা যাতে উদ্যোগগুলির অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন বাতিল হয়। সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তারা বলেছে 'অধিনায়কী

অর্থনীতি'। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার মূলকথাটা ইচ্ছা করে বোঝিয়ে তারা এ প্রশ্নের সমাধান দেখে আত্মপরিচালনায়, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়ের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা তুলে দিয়ে প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের নিকট তার হস্তান্তর।

এসব তত্ত্ব মেকিবৈজ্ঞানিক, কারণ মালিকানার অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুটা একেবারে বোঝা হয় নি। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব এই থেকে এগোয় যে মালিকানা সর্বদা বিদ্যমান থাকে ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট এক-একটা রূপে। তাতে থাকে বৈষয়িক-বস্তুগত আর সামাজিক দিকের দ্বান্বিক ঐক্য। বর্জুয়ো তাড়িকেরা দেখে কেবল একটা — মালিকানার বৈষয়িক-বস্তুগত দিকটা।

মালিকানার সামাজিক মর্মার্থটা তারা বিচার করে না। ফলে তারা উপনীত হয় মিথ্যা সিদ্ধান্তে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা প্রত্যয়জনকতার সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছে যে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত রূপের মধ্যে বৈরবিরোধ দূর হয় সমাজতান্ত্রিক সামাজীকরণের মধ্যে দিয়ে। তাতে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজের সমস্ত সভ্যের সমতা নিশ্চিত হয়। জাতীয় অর্থনীতির কেন্দ্রীকৃত, পরিকল্পিত চালনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন নাকচ করে না। কিন্তু এক-একটা গ্রুপের মালিকানার ভিত্তিতে আত্মপরিচালনার যে মডেলকে সমাজতন্ত্র বলা হচ্ছে, তাতে সমাজতন্ত্রের

অর্থনৈতিক বনিয়াদই বিদীর্ণ হয়। অর্থনীতির ঠিক কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পন ও পরিচালনার কল্যাণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখা দিয়েছে উচ্চবিকশিত উৎপাদনী শক্তি, অগ্রণী বিজ্ঞান ও টেকনিক, বেড়ে উঠছে মেহনতিদের সচ্ছলতা, সাধিত হচ্ছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কর্তব্য। সংস্কারবাদীদের এইসব কপোলকল্পনা আসছে সমাজতন্ত্রের সাফল্য আর পুঞ্জিতন্ত্রের সংকটে আতংক থেকে। পুঞ্জিতন্ত্রের পাপগুলিকে সমাজতন্ত্রের ঘাড়ে চাপাবার যে চেষ্টা, এইটেই তার কারণ।

অর্থনীতির পরিকল্পিত চালনা হল সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক এবং পুঞ্জিতন্ত্রের চেয়ে তার সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠতা এইখানেই। সেই জন্যই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পনা প্রথাকে অবিরাম সমালোচনা করে বুদ্ধিজীয়া ভাবাদর্শীরা। তবে অর্থনীতিতে পরিকল্পনার ভূমিকা নিয়ে সংস্কারবাদীদের নানা রকমের মূল্যায়নে উৎপাদনের উপায়ের সামাজীকরণ থেকে সামাজিক উৎপাদনের পরিকল্পিত বিকাশকে আলাদা করে ফেলা হয়, ইচ্ছে করেই ভুলে যাওয়া হয় যে পরিকল্পন সম্ভব কেবল সর্বজনীন মালিকানার ভিত্তিতে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহমিতালি ক্রমেই বেশি তাৎপর্য লাভ করছে বর্তমান দুনিয়ায়। নতুন ধরনের একটা আন্তর্জাতিক মেল হিশেবে তা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। উৎপাদনের উপায়ের ওপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানার বিকাশ এবং উৎপাদনী সম্পর্কের সুসম্পূর্ণীকরণে উৎপাদনী শক্তি বিকাশের সম্ভাবনা খুলে যাচ্ছে।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতিদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় সুনিশ্চিত হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠন। সাধারণ ভাবাদর্শ ও সাধারণ লক্ষ্য, কমরেডসুলভ সহযোগিতা, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা ঐক্যবদ্ধ।

খুবই স্বাভাবিক যে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি বুদ্ধিজীবি ভাবাদর্শীদের মোটেই ভালো লাগবে না। সাম্রাজ্যবাদী প্রচার কেবল ভাবাদর্শীয় সংগ্রামে সীমাবদ্ধ না থেকে আগ্রহ নেয় রাজনৈতিক প্ররোচনা আর অন্তর্ঘাতের।

কমিউনিস্টবিরোধীরা আজকাল দেখাবার চেষ্টা করছে যে বাস্তব সমাজতন্ত্র নাকি এক ‘সংকটের’ মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার কারণ নাকি সমাজব্যবস্থা হিশেবে সমাজতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত, অন্যান্য দেশের ওপর ‘সোভিয়েত মডেল’ চাপিয়ে দেবার ফল সেটা। শাসক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির কাছে সমাজতন্ত্রের ‘মডেল’ ব্যাপারটা অবৈজ্ঞানিক বলে একেবারেই অগ্রাহ্য। সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের যে কতকগুলি সাধারণ নিয়মবদ্ধতা আছে, সেটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতাতেই প্রমাণিত।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শত্রুরা ‘সমাজতন্ত্রের মূলনীতিগুলিকে’ আক্রমণ করে সমাজতন্ত্রের জাতীয় মডেলের অবস্থান থেকে। এ তত্ত্বের কাজ হল শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যহীন করা, কোনো একটা দেশের সংকীর্ণ জাতীয় বৈশিষ্ট্য সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা।

এমন লোক আছে যারা ইচ্ছে করেই অথবা তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক অদৃষ্টাবশে এক-একটা দেশ বা দেশ গোষ্ঠীর পক্ষে সমাজতন্ত্রে যাবার বিভিন্ন পথের অবজেকটিভ সম্ভাবনাকে মর্মার্থ ও নিয়মবদ্ধতার দিক থেকে কোনো দেশে ভিন্ন সমাজতন্ত্র গড়ার অবজেকটিভ অসম্ভাব্যতার সঙ্গে গুলিয়ে বসে। সমাজতন্ত্রের দিকে পথের বহুবিধতা অষ্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বাস্তব সমাজতন্ত্রের আধুনিক ‘সমালোচকদের’ কোনো আবিষ্কার নয়। সে আবিষ্কার করে গেছেন স্বয়ং লেনিনই, এটা তাঁর তত্ত্বের একটা বনিয়াদি সিদ্ধান্ত, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের যে দ্বন্দ্বিকতা তিনি উদ্ঘাটিত করে গেছেন তার একটা মূলনীতি।

তীর ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের পরিস্থিতিতে অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করে মেহনতিদের আন্তর্জাতিক একাত্মতা। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, নতুন সমাজ গঠন, নতুন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে সমস্ত দেশের মেহনতিদের একতা হল প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা। সমাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও পোষকতায় প্রকাশ পায় মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রতি তার বিশ্বস্ততা।

কমিউনিস্টবিরোধীদের ফন্দিফিকির সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা উঠে আসছে নতুন নতুন শিখরে। সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সাফল্যে মেহনতিদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাবার ব্যাপক সুযোগ খুলে যাচ্ছে। বেড়ে উঠছে পারিশ্রমিক, কাজ, জীবনযাত্রা,

বিশ্রামের পরিস্থিতি উন্নত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে
স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, সংস্কৃতির ব্যবস্থা।

সমাজতান্ত্রিক সহমিতালি আজ সমাজতন্ত্র নির্মাণের
সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার অধিকারী। মার্কসীয়-
লেনিনীয় মতবাদের প্রাণশক্তি ও আন্তর্জাতিক চরিত্র,
সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা প্রমাণিত হচ্ছে
তাতে।

কমিউনিস্টবিরোধীদের ক্ষিপ্ত আক্রমণের একটি বিষয়
হল ১৯৭৭ সালের সোভিয়েত সংবিধান। ওরা তার
অর্থ বিকৃত করার, আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ছোটো করে
দেখাবার চেষ্টা করে। বদজোয়া রাষ্ট্র নাকি অধিকারের
স্থান রাজনীতির ওপরে, এমন দাবি করে তারা দেখাবার
চেষ্টা করে যে সমাজতন্ত্রে অধিকার রাজনীতির অধীন,
সদুতরাং রাজনীতির তুলনায় সংবিধানের গুরুত্ব
গোপ।

সামাজিক বিকাশে অধিকার ও রাজনীতির
পারস্পরিকতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত করেছে
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সেটা এই যে অধিকার
রাজনৈতিক চরিত্র গ্রহণ করে নির্ধারিত করে দেয়
রাজনীতির বনিয়াদ। আধিকারিক বিধির কার্যকরতা
নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার চরিত্রের ওপর।

পৃথিবীতন্ত্রের পরিস্থিতিতে অধিকার পদরোপদরি
পৃথিবীপতির স্বার্থাধীন। আর সমস্ত মেহনতির সমান
অধিকার নিশ্চিত করে সমাজতন্ত্র, তা পালনের ওপর
কড়া নজর রাখে সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে সামাজিক সম্পর্ক

বিকাশের ওপর রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর সক্রিয় প্রভাবপাতের সম্ভাবনা বেড়ে ওঠে। সেটা নির্ধারিত হয় সামাজিক মালিকানার আধিপত্য দিয়ে, যেটা রাজনৈতিক ক্ষমতার মূলকথা। এই প্রসঙ্গেই বেড়ে ওঠে সংবিধানের ভূমিকা, গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্কে যা আইনত বিধিবদ্ধ করে। সমাজতন্ত্র সুসম্পূর্ণ করার আইনি ভিত্তি জোগায় সংবিধান।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতা জনগণের হাতে, সে ক্ষমতা বা শাসন তারা চালায় জনপ্রতিনিধিদের সোভিয়েত বা পরিষদগুলি মারফত। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যাপারাদির চালনায় সামাজিক সংগঠনাদি এবং শ্রম ষোঁথগগুলিও অংশ নেয়। সোভিয়েত সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোষকেন্দ্র হল কমিউনিস্ট পার্টি, আমাদের সমাজের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক শক্তি।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির স্থান নির্ধারিত হয় সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে তার ভূমিকা দিয়ে। শাসক পার্টি তার সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত করে সংবিধানের চৌহদ্দিতে সোভিয়েত সংস্থাগুলির মধ্যে দিয়ে। এ পার্টি সর্বাগ্রে সামনে রাখে জনগণের স্বার্থ, সমগ্র সমাজের স্বার্থ।

সমাজব্যবস্থার গণতান্ত্রিকতা নির্ধারিত হয় কতটা তা মেহনতি জনসাধারণের স্বার্থ অনুযায়ী, তার মাত্রা দিয়ে। স্বভাবতই, বর্জোয়া রাষ্ট্রের শোষক চরিত্র সমাজের সমস্ত সত্যের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে

পারে না। তা সত্ত্বেও পূর্জিতন্ত্রে মেহনতিদের অধিকার যে ক্ষতিগ্রস্ত সে সম্পর্কে চুপ করে থেকে বর্জেরিয়া ভাবাদর্শবিদরা বিশ্বের জনমতকে বিভ্রান্ত করতে চায় এই দাবি করে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা যথেষ্ট মূল্য পায় না, সংবিধানে নাগরিক বনিয়াদি অধিকার সীমাবদ্ধ।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বনিয়াদি আইনে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সন্নিশ্চিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মেহনতিদের আছে শ্রমের, অর্থাৎ কাজ পাবার অধিকার, বাসস্থানের, বিশ্রামের অধিকার, বিনা মূল্যে শিক্ষা, ডাক্তারি সাহায্য, সামাজিক ভরণপোষণের অধিকার। নারী ও পুরুষ সমান বেতন পায়। সমস্ত মেহনতি রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যাপারে ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। সমাজতন্ত্রে সবরকমের জাতীয় পীড়ন বিলুপ্ত, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সত্যকার সৌভ্রাতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

সোভিয়েত লোকেদের সচ্ছলতা বৃদ্ধি, তাদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটানোর জন্য রাষ্ট্র যে যত্ন নেয়, সেটা এইসব অধিকার কার্যকৃত করা প্রসঙ্গেই। সোভিয়েত নাগরিককে ব্যাপক অধিকার ও সুযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ সোভিয়েত সংবিধানে নিষিদ্ধ। যুদ্ধ ও জাতীয় বিদ্বেষ প্রচার এ দেশের আইনে বারণ। কারো অধিকার নেই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের।

সাম্রাজ্যবাদী প্রচার লোকেদের মাথায় ঢোকাতে চায় যে

সোভিয়েত ইউনিয়ন নাকি সারা দুনিয়ায় কমিউনিস্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সম্পর্কে সত্য কথাটা চেপে রেখে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনী মতলব নিয়ে ব্যাপক রটনা চলে। লোকেদের মন বিগড়াবার জন্য ভাবাদর্শীয় প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে চলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনীতির শঙ্করীকরণ।

কিন্তু আধুনিক অস্ত্র প্রয়োগে যুদ্ধ বাধলে সেটা হবে আধুনিক সভ্যতার পক্ষে সর্বনাশ। সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই সেটা বোঝে। সেই কারণেই তারা লোকেদের সতর্কতা ভোঁতা করে দিতে ব্যস্ত, সেই কারণে তারা শান্তির ব্যাপারে দায়টা চাপাতে চায় সমাজতান্ত্রিক দেশেদের ঘাড়ে যারা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিজেদের প্রতিরক্ষাসামর্থ্য বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

সমাজতন্ত্রের বিরোধীরা মানতে চায় না সোভিয়েত জনগণের কৃতিত্ব, যাতে সমর্থিত হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিকতা।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কম সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হয় নি। তার অনেকগুলিই ছিল সাম্রাজ্যবাদের শত্রুতামূলক গ্রিয়াকলাপের ফল। ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের (১৯৪১-১৯৪৫) কথাটা স্মরণ করাই যথেষ্ট। তাতে প্রচণ্ড হারখার হয় দেশ, আত্মবলি দিতে হয় বিপদুল। তা সত্ত্বেও ইতিহাসের দিক থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন

পরিণত হয়েছে এক পরাক্রান্ত রাষ্ট্র। সামাজিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক নির্মাণের বিশাল কর্মকাণ্ড তা সম্পন্ন করেছে সাফল্যের সঙ্গে। সমাজতন্ত্র প্রদর্শন করেছে কেবল নিজের প্রাণশক্তিই নয়, পৃথিবীতন্ত্রের চেয়ে তার তর্কাতীত শ্রেষ্ঠত্বও। সমাজতান্ত্রিক দেশে নাকি লোকেদের চাহিদায় কান দেওয়া হয় না, বুদ্ধিজীবীরা ভাবাদর্শীরা এমন অপপ্রচার যতই করুক, সমাজের সমস্ত সদস্যের সচ্ছলতা আর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করাই হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন।

এমন ভরসা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরা করে না যে শ্রেণী শত্রুরা একদিন বুদ্ধি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অবস্থানে এসে যাবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভাবাদর্শীয় মতভেদ দূর করতে হবে অস্ত্র দিয়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ শান্তিতে আগ্রহী, তাই সামাজিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক যুদ্ধকে পৃথিবীবাসীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে পৈশাচিক এক অপরাধ বলে ধিক্কৃত করতে বলে। পারমাণবিক যুদ্ধে স্বার্থপরতার দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বকে দেখা অনুচিত। এগতে হবে মানবজাতির অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ থেকে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব বুদ্ধিজীবী ভাবাদর্শীদের মূখোশ খুলে ধরে। তা দেখায় যে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিজয় হল সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মসম্মত পরিণাম। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, মূল্যবোধ ও ন্যায়ের জন্য তাদের সংগ্রামে গড়ে

উঠছে সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের পরিস্থিতি।

বাস্তব সমাজতন্ত্র হল নবীন এক সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা অবিরাম বিকাশমান ও সম্পূর্ণতামুখী। সমাজতন্ত্রের শক্তি ও আকর্ষণ এইখানে যে তাতে প্রকাশ পাচ্ছে সারা বিশ্বের ব্যাপক মেহনতি জনসাধারণের একান্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ।

উপসংহার

বর্তমান যুগের মূলকথা হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ।

মানবজাতির ইতিহাসে পুঁজিতন্ত্র শেষ শোষণ ব্যবস্থা। উৎপাদনী শক্তির বিকাশে একটা প্রবল প্রেরণা দেবার পর তা পরিণত হয়েছে সামাজিক প্রগতির প্রতিবন্ধকে। রাষ্ট্রিক-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের শোষণ দুনিয়া তার তুঙ্গবিন্দু পেরিয়ে গেছে। তীর হচ্ছে বিপ্লুলাকারে বর্ধিত উৎপাদনী শক্তি আর তার বিকাশ রোধ করা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত। বেড়ে উঠছে অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ অস্থায়িত্ব: মন্থর হয়ে আসছে অর্থনীতি বিকাশের গতিবেগ, আবর্তনশীল ও গাঠনিক সংকট, ঢালাও বেকারি, মদ্রাস্থিতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে বারোমেসে, বিপ্লু আরতনে পেঁছচ্ছে ঘাটতি বাজেট আর রাষ্ট্রীয় ঋণ। টিকে থাকছে জাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য, লঙ্ঘিত হচ্ছে

নারীদের অধিকার। মেহনতিদের আন্তর্জাতিক একাত্মতা
 ক্ষুদ্র করার প্রয়াসে বর্তমান পুঁজিতন্ত্র জাতিগত
 স্বার্থপরতা, শোভিনিজম, বর্ণবাদে উশকানি দিচ্ছে,
 অন্যান্য জাতির অধিকার ও স্বার্থ, তাদের জাতীয়
 সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে।
 সাম্রাজ্যবাদের মানববিরোধী ভাবাদর্শের দরদুন ক্রমেই
 ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লোকেদের চিত্তজগৎ।

আমাদের কালে সঙ্গত কারণেই প্রগতি আর
 সমাজতন্ত্রকে অভিন্ন জ্ঞান করা হয়। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের
 মধ্যে রয়েছে মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশের বেশি লোক,
 বহু দেশ ও জাতি, যারা মানুষ ও সমাজের মনন ও
 নৈতিক সম্পদের সর্বাঙ্গীণ উন্মোচনের পথ গ্রহণ
 করেছে। এটা একটা বাস্তব সম্ভাবনা, সমগ্র মানবজাতির
 কাছে তা তুলে ধরছে ভবিষ্যৎমুখিতার দৃষ্টান্ত।

বর্তমান কালের মূলগত বৈপ্লবিক শক্তি হল বিশ্ব
 সমাজতন্ত্র, শ্রমিক ও কর্মিউনিষ্ট আন্দোলন, সদ্যোমুক্ত
 রাষ্ট্রের জাতীয় আন্দোলন এবং ব্যাপক গণতান্ত্রিক
 আন্দোলন। সমস্ত বৈপ্লবিক, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক
 শক্তির সংহতি হল বর্তমান বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার
 বৈশিষ্ট্য, যাতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব মিলেছে
 মেহনতিদের আত্মমুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে।

সমাজতন্ত্রে মানবজাতির উৎক্রমণ প্রক্রিয়া চলেছে
 তিনটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে।

প্রথম পর্যায় শুরু হয় ১৯১৭ সালে রাশিয়ায়
 অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয়ে। তাতে
 সূচিত হয় পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ থেকে মানবজাতির

মুক্তির সূত্রপাত: পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে (সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডের আরতন) স্থাপিত হল নতুন সামাজিক সম্পর্ক, উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে কমরেডসুলভ সহযোগিতার সম্পর্ক। অক্টোবরের বিজয় অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের ওপর। অনেক দেশে গড়ে উঠল কমিউনিস্ট পার্টি, যারা স্থান নিল বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোভাগে। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় জাগিয়ে তুলল প্রাচ্যকে, সূত্রপাত করল ঔপনিবেশিক জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের।

দ্বিতীয় পর্যায়টা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত। সামাজিক বিপ্লব সাধনের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার একসারি দেশ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পথ নিল।

তৃতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন এবং সদ্যোমুক্ত জনগোষ্ঠীগুলি কতৃক ক্রমেই বেশি করে বিকাশের অপুঞ্জিতান্ত্রিক পথ গ্রহণ। এই পর্যায় থেকে দেখা যাচ্ছে যে সমাজতন্ত্র পরিণত হয়েছে বিশ্ব ইতিহাসের নির্ধারক কারিকায়।

পরবর্তী প্রত্যেকটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই পূর্ববর্তীর চেয়ে জটিল। সমাজতন্ত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। তা নির্মাণের তৈরি নকশা ছিল না এবং নেই। এটা হল একটা জীবন্ত, গতিশীলতায় বিকাশমান সমাজ, যা অবিরাম অনুধাবন ও চিন্তনের অপেক্ষা রাখে।

সমাজতন্ত্র বর্তমানে প্রয়োগ ও তত্ত্বের নতুন পর্যায়ের সম্মুখীন। ঘটনাচক্রের যে বিশেষ ঐতিহাসিক মন্ডলের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত সমাজ ও সারা বিশ্ব চলেছে তাতে প্রয়োজন হয় সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতের একটা নতুন দৃষ্টি, আবশ্যিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্য ও চরিত্রের উপলব্ধি, নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্ভুক্তি।

সাম্প্রতিক সমাজতন্ত্র আত্মজ্ঞান লাভ করে তার ভেতর নিহিত সেইসব সম্ভাবনার জন্য দরজা খুলে দেয়, যা এতদিন পর্যন্ত কাজে লাগানো হয় নি। একইসঙ্গে ছকবাঁধা বেসব নির্মিতি কার্যক্ষেত্রে সমর্থিত হতে পারল না, সেগুলোকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। অংশে অংশে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সশব্দক কোড়াতালি নয়, চলে তার সামগ্রিক পুনর্গঠন।

সন্ধান (সত্যের ওপর একাধিকারের যেকোনো প্রয়াস যাতে বর্জিত) চলে সমস্ত ধারায়, কেননা অর্থনীতি, বিজ্ঞান, বৈষয়িক সচ্ছলতা, লোকেদের চেতনা, জনগণের সংস্কৃতি সমাজতান্ত্রিক সমাজে হয়ে দাঁড়িয়েছে এতই সুগভীর যে এইসব ক্ষেত্রের যেকোনো একটির বিকাশ সামান্য পেছিয়ে পড়লেও সাধারণ বিকাশের তাল কেটে যায়। তবে মূল্যবোধের এইসব স্থানাংক বিন্যাসে নির্ধারক হয়েই থাকছে সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির লক্ষ্য হিশেবে মানদণ্ড।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্ভাব্যতা যত বাড়ে, ততই সামনে আসে বিকাশের গুণের প্রশ্ন। সামাজিক ফলপ্রদতার যে সমস্যা সেটাই তার মূলকথা।

বর্তমান সমাজতান্ত্রিক সমাজকে গুণগতভাবে নতুন অবস্থায় তোলা হল সৃজনশীল ও উদ্দেশ্যপূর্ণ একটা গঠনকর্ম। তার দাবি চূড়ান্ত অকপটতায় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কাজ চালানো। এই যে প্রক্রিয়াটা সহজ নয়, প্রায়শই যন্ত্রণাকর তাতে প্রয়োজন হয় ভুল স্বীকার করা এবং তা হতে না দেওয়া। কেননা নৈতিবাচক ব্যাপার যদি সমাজে যথেষ্ট দীর্ঘদিন টিকে থাকে, তাহলে সামাজিক সম্পর্ক, তার কোনো একটা অংশ বিকৃত হবার মতো প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। অতীতের দায়িত্বশীল বিশ্লেষণে পরিষ্কার হয় ভবিষ্যতের পথ আর অর্ধসত্য, সসংকোচে যা খোঁচা খোঁচা কাঁটাগুলো এড়িয়ে যায় তাতে বাস্তব পলিসি রচনা আটকে থাকে, ব্যাহত হয় অগ্রগতি। সামাজিক জ্ঞান খোদ সমাজতান্ত্রিক সমাজের মতোই নিরন্তর গতিশীল, বিকাশমান।

আরো একবার সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে ভাবা হচ্ছে। অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলিকে মনুস্ত করার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রয়াস চালিত। কেননা রাষ্ট্রব্যাপী উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে কেবল প্রতিটি স্বতন্ত্র কর্মীর সততাশীল কাজের ওপরেই নয়। সর্বাপ্রে তা নির্ধারিত হয় উৎপাদনের যুক্তিযুক্তরূপে সংগঠিত পরিচালনা দিয়ে, কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা আর মূল উৎপাদক ধাপ, কলকারখানা আর উদ্যোগাদির স্বাবলম্বনের মাত্রার মধ্যে সূক্ষ্ম সম্পর্ক দিয়ে, দাম নির্ণয়ের সুচিন্তিত (সুশৃঙ্খল) ব্যবস্থা দিয়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিতে যেসব সমাজতান্ত্রিক নীতি ও স্বেচ্ছা এতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে কাজে লাগানো হয় নি, সেগুলিকে সক্রিয় করে তোলার প্রবণতা আইনে বিধিবদ্ধ হয়। পাশ হয়েছে শ্রম যৌথ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান (উদ্যোগ), ব্যক্তিগত শ্রমকর্ম বিষয়ে আইন।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে বৈশিষ্ট্যসূচক হল রাষ্ট্রচালনায় প্রধানত প্রশাসনিক, ঐচ্ছিক থেকে অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে উত্তরণ। তবে অর্থনীতি পুনর্নির্মাণের এই পথ নিলেও সমাজতান্ত্রিক দেশেরা মনে রাখে যে ইতিবাচক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেবে নতুন নতুন বিরোধ, মর্শকিল, অসম্পূর্ণতা, কিছু কিছু কুফলও অনিবার্য — ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্বিকতাটাই এমনি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বর্তমান পর্যায়ের বিকাশের বৈশিষ্ট্য হল তার সমস্ত মাত্রায় — বনিয়াদ আর উপরিকাঠামো, সামাজিক ক্ষেত্র আর সংস্কৃতি, সমগ্রভাবে গোটা সমাজজীবনে সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণীকরণের ব্যবহারিক ব্যবস্থা। সক্রিয় ও সুসম্পূর্ণ করে তোলা হচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত ব্যবস্থা, প্রকাশ্যতা, রাজনৈতিক পরিচালনার পদ্ধতি, মেহনতির ক্রমেই বেশি করে সক্রিয় অংশ নিচ্ছে রাষ্ট্রের আইন ও পরিকল্পনাগুলির আলোচনায়। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সেবায় যাকিছু লাগে, সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমস্ত ধাপেই তেমন সবকিছুকে সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে।

সমাজতন্ত্রের জন্য সাধারণ নাগরিক দায়িত্ববোধ লক্ষ লক্ষ মেহনতির রাজনৈতিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলেছে। সমস্যাকে তারা যেভাবে দেখে তাতে প্রায়ই থাকে সত্যের খাঁটি স্বর্ণবীজ, মনোভঙ্গির সজীবতা আর মৌলিকতা, স্বকীয় ধরনের তেমন বিশ্ব দর্শন, যা থেকে মানবজাতি সর্বদা ধন্য হয়েছে অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে।

সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়াস। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কার্যকলাপ থেকে দেখা গেছে যে উৎপাদনের সামাজিক দিকটায় মনোযোগ হ্রাস পেলে নিজেদের শ্রমফলে মেহনতির আগ্রহ কমে যাবার আশংকা থাকে, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে পরিবর্তন ও প্রকাশ্যতায় ভীত মাঝারিদের ঈর্ষাতুর স্বার্থ, গোষ্ঠীবদ্ধ সেই স্বার্থ যা দম্পরাশ্রয়িতা, স্থানীয় সংকীর্ণতা, রক্ষণশীলতা আর উপদলীয়তার রূপ নেয়। সেইজন্য সামাজিক নবায়নের অভ্যন্তরীণ কর্তব্য সম্পাদনে সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি দীর্ঘকালীন সুদৃঢ় সামাজিক পলিসি নির্ণয় করেছে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতিগত গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শগুলির সর্বাঙ্গীণ রূপায়ণের পথ নেওয়া হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। ২০০০ সাল নাগাদ প্রতিটি সোভিয়েত পরিবারের জন্য পৃথক ফ্ল্যাট বা নিজস্ব গৃহের ব্যবস্থা করার কথা হয়েছে। জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের উদ্যোগ নির্মাণও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহর ও গ্রামের

অধিবাসীদের জন্য পণ্য সরবরাহ ও সামাজিক সেবা ব্যবস্থা বেড়ে উঠছে, সম্পূর্ণ হচ্ছে পৌর অর্থনীতি উন্নয়নের কাজ।

মানুষের জন্য, অবিরাম তার জীবনযাত্রার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি সর্বদাই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পলিসির মূলকথা। সোভিয়েত লোকদের পণ্য ও সার্ভিসের চাহিদা মেটাবার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রীতিমতো পরিপূরণের ভার দেওয়া হচ্ছে সামবায়িক ও ব্যক্তিগত শ্রমের ওপর।

সামাজিক সমন্বয়নের ক্ষেত্রে সঠিক, বাস্তব একটা পথ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল অতিক্রান্ত পথের সূচিস্তিত বিশ্লেষণ। আগে লোকের আয় সর্বদা কেবল তার শ্রম অবদান, তার সৃজনী সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করত না। আগে শ্রম ফলের মূল্যায়নে সমমাত্রিকতার একটা ঝোঁক ছিল, সেটা কাটিয়ে উঠে পুরোপুরি এই সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রতিষ্ঠা করার পথ নেওয়া হয়েছে: প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে। এইভাবে সমাজতন্ত্রে সামাজিক ন্যায়ের নীতি বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে।

তথাকথিত বিশেষ সুবিধা সম্পর্কে কয়েকটা কথা। সমাজতন্ত্রে সমস্ত বিশেষ সুবিধা ধার্য করে রাষ্ট্র। সমাজের পক্ষে হিতকর শ্রমের গুণ এবং পরিমাণ আর নির্দিষ্ট লোকটির ব্যক্তিগত অবদানের হিসেব নেওয়া হয় তাতে। যেমন বড়ো বড়ো বিজ্ঞানী, একাডেমিসিয়ান, তেমনি যেসব শ্রমকারী সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে উল্লেখযোগ্য অবদান যোগ করে, তাদের জন্যও সমাজতান্ত্রিক

রাষ্ট্র সযত্ন। কথাটা হচ্ছে তেমন বিশেষ স্দবিধা নিয়ে যা সমাজের কোনো একজন সদস্যকে রাষ্ট্র দেয় গোটা সমাজের স্বার্থে। আর যে স্দবিধা রাষ্ট্র ধার্য করে না, কিন্তু সামাজিক পদাধিকারবলে কেউ কেউ যা নিজের জন্য নেবার চেষ্টা করে, সেটা গ্রহণীয় নয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত সভ্যের পরিপূর্ণ সচ্ছলতা আর অবাধ, সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হল শাসক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির কর্মসূচিগত লক্ষ্য।

সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে নতুন, যথাযথ দৃষ্টিপাতে নির্ধারিত হয়েছে সমাজতন্ত্রের সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের পরবর্তী ধারা। অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কে কার্যকৃত করা হচ্ছে যে পারস্পরিক লাভজনক অর্থনৈতিক যোগাযোগ তাতে সূচিত হচ্ছে প্রধানত বাণিজ্য থেকে বিশেষীকৃত ও সামবায়িক উৎপাদনে উত্তরণ।

তবে এ পথে নির্দিষ্ট নানা কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অন্য সমস্যাও দেখা দিচ্ছে, যাতে এই ধরনের সহযোগিতার আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া আটকে থাকছে। সর্বাপ্রে এটা অর্থনৈতিক, পরিচালনামূলক, আইনধাটিত প্রশ্ন, তথা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, উৎপাদন ব্যয়ের মূল্যায়ন, দাম নির্ণয়, আয় বণ্টন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে।

বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে মূলনীতিগত প্রশ্নগুলিতে ক্রিয়ার সমন্বয়, পরস্পরের সাফল্যে কমরেডসুলভ আগ্রহ, গৃহীত দায়িত্বের যথাযথ পালন, জাতীয় এবং সাধারণ, আন্তর্জাতিক স্বার্থকে তাদের

আঙ্গিক পারস্পরিকতায় গভীরভাবে বোঝা। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় চলছে যেমন দ্বিপাক্ষিক, তেমনি বহুপাক্ষিক ভিত্তিতে। এতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সংহতি, বিধানপ্রণয়নীয় সংস্থা, সামাজিক সংগঠন ইত্যাদির মধ্যে যোগাযোগ বিকাশে সাহায্য হয়।

সক্রিয় হয়ে উঠছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নাগরিকদের মধ্যে, বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন প্রজন্মের লোকের মধ্যে জীবন্ত, ব্যাপক মেলামেশা, আদান-প্রদান। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানে, অত্যন্ত জটিল সমস্যার পরস্পর গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে শিখছে কমিউনিস্টরা।

কথোপকথন, আলোচনা শুদ্ধ যোগাযোগের নয়, ভাবনা-চিন্তা করারও একটা উপায়। এতে সম্ভব হয় প্রশ্নটি সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিকোণটা সূচীকর্ষণ করা, সহানুভূতির চোখ দিয়ে সমস্যাটা দেখা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি গঠনমূলক আলাপের, সভ্যতার মানবিক মূল্যবস্তুগুলির রক্ষণ ও বর্ধনের জন্য সারা গ্রহ জুড়ে রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের সৃজনশীল পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মের পক্ষপাতী।

আমাদের কালের মহনীয়তা ও অভিনবত্ব এইখানে যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণ ক্রমেই স্পষ্টাকারে এবং খোলাগদূলি তাদের কথা ভাবতে বাধ্য করছে। কোটি কোটির স্বার্থ ও অভিপ্রায় কতটা মানা হল সেটা কেবল এক-একটা সিদ্ধান্তের সঠিকতার নিরিখই নয়, বহুবিধ স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতারও ভিত্তি। মস্কায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের

৭০-তম বর্ষের উৎসবে যোগদান করেন বিভিন্ন পার্টি ও আন্দোলনের যেসব প্রতিনিধি, তাঁদের মিলন সভায় শূন্য হ'ল বর্তমান কালের জরুরি প্রশ্ন নিয়ে এমন গণতান্ত্রিক মতবিনিময় যা নিতান্ত বাহ্যিক নয়। তাতে কমিউনিস্ট আর অকমিউনিস্টদের মধ্যে কোনো বেড়া ছিল না, সবাইকেই মিলিত করে সমাধিকারে খোলাখুলি কথোপকথনের বাসনা। তাতে যেসব কথা শোনা গেল সেটা আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে অবাধ ও একাধিক সামাজিক মতামতের গুরুত্ব স্বীকৃতিরই আরো একটা সাক্ষ্য।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যা শ্রেণীগত আর যা সর্বমানবিক তার দ্বন্দ্বিকতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নতুনভাবে রাজনৈতিক চিন্তার প্রস্তাব দিয়েছে কমিউনিস্টরা। সর্বাত্মে তা চালিত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে, যার ভিত্তিতে থাকবে সর্বমানবিক মূল্যবোধ, পারমাণবিক অস্ত্রবর্জিত দুনিয়া গড়ার লক্ষ্যে বৃহদাকার উদ্যোগ। মানবজাতির বিচারবুদ্ধি দাবি করছে যে নতুন সহস্রকের দোরগোড়ায় রাষ্ট্রগুলো তাদের পারমাণবিক বোমা ঝেড়ে ফেলুক। ১৯৮৭ সালে ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক পরামর্শ কমিটির যে অধিবেশন হল, তাতে আরো একবার দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষিত হল: নিজেদের নতুন সামাজিক ব্যবস্থার প্রকৃতিবশেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের ভবিষ্যতকে আন্তর্জাতিক সমস্যার সামরিক সমাধানের সঙ্গে জড়িত করে নি এবং করছে না। যে পলিসিতে পর্যায়ক্রমিক নিরস্ত্রীকরণে পৌঁছনো

যেতে পারে এবং যাওয়া উচিত তার স্বেচ্ছাপাত হয়েছে মাঝারি ও কম পাল্লার রকেট নিশ্চিত করা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর রকেট কেবল পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের ৪ শতাংশ মাত্র। তাই গৃহীত সিদ্ধান্তকে কেবল জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পথে প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ বলেই ধরা যেতে পারে।

বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তির জাতিসংঘের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার, আন্তর্জাতিক জনসমাজ তাকে এবং তার সংস্থাটিকে যে অধিকার দিয়েছে তার পুরোদস্তুর ও সত্যকার সদ্যবহারের দৃঢ় পক্ষপাতী। জাতিসংঘ যাতে সমস্ত রাষ্ট্রের স্বার্থসাম্য নিয়ে কর্তৃত্বের সঙ্গে আলোচনা বসতে এবং তা সমাধানের যৌথ সন্ধানের ব্যবস্থা করতে, সাফল্যের সঙ্গে তার শান্তিরক্ষণী কাজ চালাতে পারে, তার জন্য কমিউনিস্টরা তাদের সাধ্যায়ত্ত সবকিছু করে থাকে।

সমস্যা জমে উঠেছে অনেক। তবে মর্শাকিলের কথা বললেও কমিউনিস্টরা জানে কী বিপুল অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সম্ভাব্য শক্তি হাতে আছে তাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। সমাজতন্ত্র প্রত্যেককে দিয়েছে শ্রম, বিনামূল্যে শিক্ষা আর চিকিৎসা পাবার অধিকার, সুদৃঢ় বাসস্থান। এগুলো হল বর্তমান সমাজতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব সেইসব আশীর্বাদ যা মানুষকে রক্ষায় নিয়োজিত, আজকেও, ভবিষ্যতেও। সমাজতন্ত্র আর মানবতা অবিভাজ্য।

ব্যবহৃত পরিভাষার সংক্ষিপ্ত অর্থ

আগ্রাসন — এক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বেআইনি শক্তি প্রয়োগ।

উৎপাদনী শক্তি — উৎপাদনের উপায় এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান, উৎপাদনের অভিজ্ঞতা আর শ্রমাত্যাস নিয়ে যেসব লোক তা চালু করে। উৎপাদনী শক্তি সর্বদা বিকশিত হয় নির্দিষ্ট একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপে, এক-এক ধরনের উৎপাদনী সম্পর্কের পরিস্থিতিতে।

উৎপাদনী সম্পর্ক — বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও পরিভোগ প্রক্রিয়ায় লোকেদের মধ্যে অবজেকটিভ যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে একত্রে এসম্পর্ক গড়ে তোলে ইতিহাসের দিক থেকে নির্দিষ্ট এক-একটা উৎপাদনের ধরন বা প্রণালী। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ একটা অমীমাংসেয় বৈরিতার চরিত্র ধরে না, যথাসম্ভব

পূর্ণাকারে মেহনতিদের স্বার্থ সাধনের লক্ষ্যে শ্রমজীবীদের পরিকল্পিত উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তার সমাধান হয়।

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন বা পুঞ্জীভবন — বৃহদায়তনে উৎপাদন, বিশেষীকৃত এক-একটা উদ্যোগে উৎপাদনের সমাহতি। পুঞ্জীভবনে উৎপাদন কেন্দ্রীভবনের শর্ত হল পুঞ্জির কেন্দ্রীভবন, মজদুর-খাটা শ্রম শোষণের ভিত্তিতে তার পুঞ্জীভবন। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন বিকশিত হয় সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা অবিরাম বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পিত উপায়ে।

কমিউনিজমবিরোধিতা — সাম্রাজ্যবাদের প্রধান ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক হাতিয়ার, যার মূলকথা হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুৎসা, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির রাজনীতি ও লক্ষ্য, মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদকে বিকৃত করে দেখানো, তার অপপ্রচার।

কৃষি সংস্কার — শ্রমের সমবায় ও উৎপাদনী উপায়ের সামাজীকরণের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রে কৃষক জোতের প্রগাঢ় পুনর্গঠন এবং বৃহৎ কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থা।

ঘোষণা — বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক একটা চুক্তি, যাতে রাষ্ট্র, আন্তঃসরকারি সংস্থা বা সামাজিক সংগঠনাদি

রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে তাদের নীতি নির্দিষ্ট করে বা কোনো কোনো প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান জানায়।

জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পন — সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গ্রন্থাকলাপের মূলগত প্রণালী। উৎপাদনী উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে প্রণালীবদ্ধ, যথানুপাতিক বিকাশের যে অবজেকটিভ নিয়ম সক্রিয় হয়ে ওঠে, তার দাবি অনুসারেই চলে পরিকল্পন। পরিকল্পন মানে পরিকল্পনা রচনা, তা পূরণের ব্যবস্থা আর তার নিয়ন্ত্রণ। পরিকল্পিত অর্থনীতি হল সমাজতন্ত্রের একটা বড়ো সুবিধা। তাতে নিশ্চিত হয় অর্থনীতির নিঃসংকট বিকাশ, জনগণের অবিরাম সচ্ছলতা বৃদ্ধি।

ভিক্রি — রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সংস্থা যে আদেশ, নিয়ম, আইন জারি করে।

নিঃস্বার্থ সাহায্য — সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে যে সাহায্য করে নিজেদের জন্য কোনো বিশেষ মুনাব্বা তোলায় উদ্দেশ্যে নয়।

পুঁজিতন্ত্র — উৎপাদনী উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা আর পুঁজিপতি কর্তৃক মজদুর-খাটা শ্রম শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্ব —
পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক
রূপান্তরের সময়টা। তার শুরুর শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে, সমাপ্তি সমাজতন্ত্রের
বনিয়াদ নির্মাণে।

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট — পুঁজিতন্ত্রের সামগ্রিক
সংকট, তার অর্থনীতি আর রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনীতি,
ভাবাদর্শ আর সংস্কৃতি, সব নিয়ে।

পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা (সম্পত্তি) — বদজোয়া
রাষ্ট্রের যে সম্পত্তি গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় বাজেটের টাকায়
নির্মিত বা পুঁজিতান্ত্রিক জাতীয়করণ মারফত
পাওয়া উদ্যোগগুলিতে। তা শাসক শ্রেণীগুলির
স্বার্থাধীন।

প্রতিযোগিতা — উৎপাদনী উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত
মালিকানার ফলে কাঁচামালের উৎস, বাজার,
পুঁজিলব্ধির ক্ষেত্রের জন্য, মুনাব্বার বেশির ভাগটা
হস্তগত করার জন্য এক-একজন পুঁজিপতি আর
এক-একটা পুঁজিতান্ত্রিক দেশের মধ্যে নিষ্ঠুর সংগ্রাম।
পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সমস্ত ধাপেই প্রতিযোগিতা
তার প্রকৃতিগত ধর্ম।

প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে বণ্টন — বণ্টনের
কমিউনিস্ট নীতি; যখন শ্রম হয়ে দাঁড়ায় মানদুষ্কের

প্রাথমিক প্রয়োজন এবং সমাজে দেখা দেয় দ্রব্যের
প্রাচুর্য, তখন প্রত্যেকে সবই পায় যতটা তার দরকার।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব
সাধিত হলে শ্রমিক শ্রেণীর যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত
হয়। প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক রত হল
পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং সেই সঙ্গে জাতীয় পীড়নের
বিলোপ ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ।

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা — কমিউনিস্টদের অতি
গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের
তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমস্ত ক্ষেত্রে তা বিধৃত। তাতে
বোঝায় শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক একাত্মতা,
পারস্পরিক সাহায্য, কর্মের ঐক্য, জাতিগুলির
স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের প্রতি শ্রদ্ধা।

বিকাশের অপুঁজিতান্ত্রিক পথ — অর্থনীতির দিক
থেকে পশ্চাৎপদ দেশগুলির ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্র এড়িয়ে
প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ সমাজতন্ত্রে
উত্তরণের প্রক্রিয়া।

বেকারি — পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি সামাজিক
পরিণাম, যাতে মজদুর-খাটা লোকেদের একাংশ
কর্মচ্যুত হয় ও জীবিকা হারায়, গড়ে তোলে শ্রমের
মজদুর বাহিনী। বেকারিকে পুঁজিপতিরা কাজে
লাগায় কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের শোষণ বৃদ্ধির জন্য।

বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি — বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরস্পর সংশ্লিষ্ট সম্মুখ বিকাশ, যা ঘটছে বৈশ্বিক উৎপাদনের চাহিদা, সামাজিক প্রয়োজনের বৃদ্ধি ও জটিলতার ফলে। তাতে উৎপাদনকে চালানো সম্ভব হয় প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সৃষ্টিকে সচেতন প্রয়োগের টেকনোলজিকাল প্রক্রিয়ায়। বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির দুটি রূপ পরস্পরনির্ভর: ১) বিবর্তনমূলক, উৎপাদনের চিরাচরিত বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল ভিত্তির অপেক্ষাকৃত ধীর ও আংশিক উন্নয়ন; ২) বৈপ্লবিক, যা রূপ নিচ্ছে আমূল বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল পরিবর্তনে। কোথায় কোন সামাজিক ব্যবস্থার প্রাধান্য সেই অনুসারে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির সামাজিক-অর্থনৈতিক ফলাফলও হয় বিভিন্ন।

ভাবাদর্শ — নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যয়, আদর্শাদির তন্ত্র। প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শ হল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ — কার্ল মার্ক্স, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের বৈপ্লবিক মতবাদ; দার্শনিক, অর্থনৈতিক আর সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা অখণ্ড বৈজ্ঞানিক তন্ত্র, যা হল শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষা; বিশ্ব বিষয়ে প্রজ্ঞান ও তার বৈপ্লবিক পুনর্গঠন, সমাজ, প্রকৃতি আর মানবিক চিন্তন বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে

বিজ্ঞান। দেখা দেয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিজ্ঞানের সমস্ত সুকৃতি, অগ্রণী সামাজিক চিন্তার ভিত্তিতে, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের সামান্যীকরণের ভিত্তিতে। এ মতবাদের মূলভঙ্গি: দর্শন — দ্বন্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ; রাষ্ট্রীয় অর্থশাস্ত্র; বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম। সমাজতান্ত্রিক দেশেদের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি দ্বারা পরবর্তী কালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে সৃজনশীল বিকাশ ঘটেছে, সেটা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার ও তথ্যাদির সাধারণীকরণ, বিশ্ব বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলন ও মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চরিত্র আন্তর্জাতিক।

মুদ্রাস্ফীতি — প্রচলনে ছাড়া কাগজে মুদ্রার মূল্যহ্রাস, তার প্রয়ক্ষমতার অবনতি।

লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা — বৃহৎ ষোঁথ জোতে স্বেচ্ছায় মিলনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রে কৃষক জোটগুলির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান — বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাপ্রাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি ঘোষণা করেছে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা। তাতে বোঝায় বহির্নীতির একটা পদ্ধতি হিশেবে যুদ্ধ বর্জন, রাষ্ট্রগুলির সমাধিকার, সমস্ত জাতি কতৃক স্বাধীনভাবে

নিজ নিজ ভাগ্য বিধানের অধিকার স্বীকৃতি, রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ও ভূভাগের অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা, তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার বিকাশ।

শোধানবাদ — শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক ধারা, যা 'নবায়ন', পুনর্বিচার', 'সংশোধনের' নামে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের মতবাদকে বিকৃত করে এবং মার্কসীয়-লেনিনীয় পার্টিগুলির প্রতি শত্রুতার মনোভাব নেয়।

শোষণ — উৎপাদনী উপায়ের ব্যক্তিগত মালিক শ্রেণী দ্বারা দাম না দিয়ে প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের একাংশ শ্রম আত্মসাৎকরণ।

শ্রম অনুযায়ী বণ্টন — সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়ম, এতে সমাজের প্রতিটি সদস্য যতটা শ্রম সমাজকে দিচ্ছে, বৈষয়িক সম্পদও সে পায় সেই পরিমাণে।

শ্রমিক শ্রেণী — আধুনিক সমাজের সবচেয়ে অগ্রণী ও প্রগতিশীল শ্রেণী; ঐতিহাসিক অগ্রগতির, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে উত্তরণের প্রধান চালিকা শক্তি।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা — উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের

ফলপ্রসূতা। তা মাপা হয় উৎপাদিত দ্রব্যের এক-একটি এককের জন্য ব্যয়িত সময় অথবা সময়ের এককে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ দিয়ে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর শর্ত: ১) বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি; ২) কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি; ৩) বিশেষীকরণ আর সমবায়ীকরণ; ৪) প্রাকৃতিক পরিস্থিতির যুক্তিসঙ্গত সদ্ব্যবহার।

শ্রেণী সংগ্রাম — যেসব সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থ আপোষহীনরূপে বিপরীত, তাদের মধ্যে সংগ্রাম। উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রেণীর উদ্ভবকাল থেকে সমাজের গোটা ইতিহাস হল শোষক ও শোষিত শ্রেণীদের মধ্যে অবিরাম শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণী সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ হল রাজনৈতিক সংগ্রাম, যার কাজ হল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভুত্ব উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

সংবিধান — রাষ্ট্রের বনিয়াদি আইন, যা নির্ধারিত করে দেয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি, রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠনের প্রণালী, তাদের ক্রিয়াকলাপের এজেন্ডার, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য।

সংস্কারবাদ — শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে একটি রাজনৈতিক ধারা যা শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রয়োজন অস্বীকার

করে, বৈরী শ্রেণীগুলির মধ্যে সহযোগিতার পক্ষ
নেয়, চেষ্টা করে বুদ্ধোন্মীয়া আইনের আওতাতেই
সংস্কারের মাধ্যমে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকে 'সার্বিক
সমৃদ্ধির' সমাজে পরিণত করার।

সভ্যতা — সমাজের বৈবরিক ও আত্মিক কৃষ্টি বিকাশের
ধাপ, মাত্রা। সমাজতন্ত্রের বিজয়ে শূন্য হয় নতুন
সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার রূপলাভ, যখন সভ্যতার যা
আশীর্বাদ তার প্রগতি শ্রমজীবী মানুষ সে আশীর্বাদ
ভোগের বাস্তব সুযোগ পায়।

সমবায় — উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক
মালিকানার ভিত্তিতে একত্রে উৎপাদনী কাজ চালাবার
জন্য কৃষক বা কারুজীবীদের স্বেচ্ছামূলক জোট।

সমাজতন্ত্র — পুঁজিতন্ত্রের জায়গায় আসা সমাজব্যবস্থা,
কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়।

সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের প্রথরীকরণ — ন্যূনতম খরচায়
যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট মানের
দ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধি। তার তিনটি দিক: ১) উৎপাদনে
বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের সুকৃতি প্রয়োগ; ২)
পরিচালন ব্যবস্থার সমন্বয়ন; ৩) কর্মীদের নৈপুণ্য
বর্ধন।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভূতি — উৎপাদনী

শক্তির আরো উন্নয়ন, সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল মান অর্জন, জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্তব্য সাধনের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে প্রয়াসের মিলন ও পরিকল্পিত সমন্বয়।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা — কর্মীদের সৃজনী সক্রিয়তা বৃদ্ধির ভিত্তিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা — উৎপাদনের উপায়ের ওপর সর্বজনীন মালিকানা, সমগ্র জনগণের সাধারণ সম্পত্তি: ভূমি, ভূগর্ভ, বন, জলসম্পদ এবং শিল্প, কৃষি, নির্মাণ, পরিবহণে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়, সাংস্কৃতিক মূল্যবস্তু ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন — বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক শিল্প, সর্বাত্মক ভাৱি শিল্পের পরিকল্পিত গঠনের মাধ্যমে দেশের পশ্চাৎপদতা দূর করে তাকে শিল্পোন্নতে পরিণতকরণের প্রক্রিয়া, যাতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের আধিপত্য নিশ্চিত হয়।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — সামাজিক বিকাশের এক-একটা ধাপ, ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তদনুযায়ী রাজনৈতিক ও

আইনি উপরিকাঠামো তথা সামাজিক চেতনোর রূপ দ্বারা বা চিহ্নিত। প্রতিটি ব্যবস্থার ভিত্তি হল তার বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের ধরন, উৎপাদনী সম্পর্কের ব্যবস্থা। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি এইরকম: আদিম গোষ্ঠীসমাজ, দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সমাজ। একটা ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় উৎক্রমণের চরিত্রটা বৈপ্লবিক, প্রগতিশীল।

সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা — কাজকারবার বিকাশের অর্থনৈতিক ফলাফল যা প্রকাশ পায় ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বাধিক সাফল্য লাভে। সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতার মানদণ্ড প্রতিটি উৎপাদনী ধরনের ক্ষেত্রে তারই বৈশিষ্ট্যসূচক এবং উৎপাদনী সম্পর্কের চরিত্র দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের তেমন বিকাশ ফলপ্রদ, যাতে নিশ্চিত হয় মেহনতিদের সর্বাধিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি।

সামাজিক প্রগতি — সামাজিক বিকাশে অগ্রগতি, উচ্চতর মানে তার উন্নয়ন।

সামাজিক বিপ্লব — সামাজিক ও রাজনৈতিক (রাষ্ট্রীয়) ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন, যাতে সূচিত হয় অচল হয়ে পড়া সামাজিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং নতুন প্রগতিশীল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী মেহনতিদের সহযোগে যে

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটায় তাতে বৃজোঁয়া ক্ষমতার
উচ্ছেদ হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা অর্থাৎ কোনো না
কোনো রূপে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়,
সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজ চলতে থাকে,
যাতে সামাজিক পীড়ন, মানদুষ কর্তৃক মানদুষের শোষণ
থাকে না, প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

সাম্রাজ্যবাদ — একচেটিয়া পুঞ্জিতন্ত্র, পুঞ্জিতন্ত্রের
সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায়।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

ফ. ডলকড, ত. ডলকড। উদ্ভূত-মূল্য কী
(‘সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ’
গ্রন্থমালা)

এই বইয়ে উন্মুক্ত হয়েছে উদ্ভূত-মূল্যের
সারকথা, দেখান হয়েছে তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া,
ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ প্রশ্নে বুর্জোয়া ধ্যান-
ধারণার অসারতার নানা কারণ।

বইটিতে আলোচিত হয়েছে এমনসব মূল
ধারণা, যেমন, উদ্ভূত-মূল্যের মোট পরিমাণ ও
হার, নির্ধারিত হয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদন
প্রণালীর অর্থনৈতিক শ্রেণীবর্গ ব্যবস্থায় উদ্ভূত-
মূল্যের স্থান এবং পুঁজিপতিদের ধনবৃদ্ধিতে
উদ্ভূত-মূল্যের ভূমিকা।

আধুনিক পরিসংখ্যান তথ্য ব্যবহার করে
লেখকদ্বয় চাক্ষুষভাবে ও সহজ ধরনে দেখিয়েছেন
পুঁজিবাদী দেশগুলির মেহনতিদের অবস্থার
অবনতির উপর উদ্ভূত-মূল্যের প্রভাব।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

আ. বৃজ্জয়েভ। পুঁজিতন্ত্র কী ('সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ' গ্রন্থমালা)

জনবোধ্য ধরনে লিখিত এই বইতে আধুনিক পুঁজিবাদের প্রধান প্রধান সমস্যা আলোচিত হয়েছে।

একটা অর্থনৈতিক মূল প্রত্যয় হিসেবে পুঁজির সারমর্ম কী? পুঁজিবাদী শোষণের প্রধান রূপগুলি কী? পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানা কী? সাম্রাজ্যবাদের, অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু ও মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট বলতে কী বোঝায়, তার বহিঃপ্রকাশ কী? পুঁজিবাদের কোনো ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নেই কেন?

এই সমস্ত প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এই বইটিতে।

ব্যাপক পাঠকসাধারণের জন্য লিখিত।

19th June 1996

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

স. ইলিন, আ. মতিলেভ। অর্থশাস্ত্র কী
(‘সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ’
গ্রন্থমালা)

সাধারণভাবে বিজ্ঞানে, এবং বিশেষ করে সমাজ-
বিজ্ঞানে অর্থশাস্ত্র কেমন স্থানাধিকারী? এর
বিবেচনাভূক্ত সমস্যাবলীর গোটা সমাহার ব্যাখ্যার
জন্য তা কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করে?
লোকজনের ক্রিয়াকলাপের জন্য, তাদের
ঐতিহাসিক ব্যবহারিক কাজের জন্য তার তাৎপর্য
কেমন?

এ সব ব্যাপারই জনপ্রিয়, বোধগম্য আকারে
এই বইয়ে বর্ণিত হয়েছে।



সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-থ

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বই:

সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

✓ অর্থশাস্ত্র কী

✓ দর্শন কী

✓ বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম

✓ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী

✓ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?

পুঁজিতন্ত্র কী

✓ সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়

✓ কমিউনিজম কী

শ্রম কী

উদ্ধৃত-মূল্য কী

সম্পত্তি-মালিকানা কী

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম

পার্টি কী

রাষ্ট্র কী

বিপ্লব কী

উত্তরণ পর্ব কী

মেহনতি মানুষের ক্ষমতা কী

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী